করে রাখা মন্দ নয়—বিশেষ এতে যখন কোনই ক্ষতি নেই। কিন্তু খু
কি মনে করবেন ?"

শরৎ অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই জন্যেই তোমায় দরক
মাকে আমি এ কথা বলতে পারব না। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে এ কা
করে দেও। মাকে না জানিয়েও করা চলে, কিন্তু কোন রকমে
কাণে কথাটা উঠলেই মা একেবারে অনর্থ করবেন। সেই জন্যে ভা
বলে করাই ভাল।"

মায়ের কাছে কথাটা তোলা সত্যই শক্ত। অশোক ভাবিয়া চি
বলিল, "আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আজ আর বলা
না। তাহলে উনি ভাববেন দুজনে পরামর্শ করে এই কায করা
সময় মত একদিন কথায় কথায় এ প্রসঙ্গ তুলব।"

শরৎ দুয়ারের দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু
দেরী কোরোনা; ২।১ দিনের মধ্যেই কথাটা তোল। আমি নিজে
বুঝছি, আমার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।"

কথাটা যে সত্য তাহা অশোক খুবই জানিত। বার বার স
প্রতিবাদ করা মানুষের শক্তিতে সব সময়ে কুলায় না। সে এ[illegible] কথ
একপ্রকার মানিয়া লইয়াই চুপ করিয়া রহিল।

ঘণ্টা খানেক পরে যোগমায়া পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে
তাঁহার দেহখানি পরিষ্কৃত শুভ্র বসনে আবৃত। দেখিলেই বুঝা যায়,
মাত্র অর্দ্ধস্নান করিয়া আসিয়াছেন। মুখখানিতে সর্ব্বদা একটি বিষণ্ণ
ভাব লাগিয়া আছে। একটি পবিত্রতার মাধুর্য্য সারা দেহ ভ
বিরাজমান।

যোগমায়া আসিয়াই আলনা হইতে একখানি সুকোমল সুদৃশ্য আ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা—বংশমর্য্যাদা

হরধামের যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট কুলীন ছিলেন। তাঁহাদের আদিবাস বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার প্রপিতামহ হরিদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হরধাম গ্রামে উঠিয়া আসেন। শুনা যায় উক্ত প্রপিতামহ হরিদেবের নাকি ৫৬টি স্ত্রী ছিলেন ; এবং অতগুলি বন্ধন সত্ত্বেও যখন তি[illegible] ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তখন সেই সংবাদ [illegible]লেন [illegible] কিছুই ঘটে নাই। ৫৫টি বিভিন্ন পল্লী হইতে এক[illegible]তে ক্রটি করে নাই, কিন্তু তিনি ছিল। ৫৫টি ব[illegible] ও বৃদ্ধ সমাজের ভ্রূকুটী গ্রাহ্য করেন নাই। [illegible] উদার ক্ষমাশীল ব্যবহারে স্ত্রীর মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার এবং তাঁ[illegible] [illegible] ছিল না এবং এই অনুতাপই তাঁহার অকালমৃত্যুর [illegible]হইয়াছিল। শেষ জীবনে স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিতে করি[illegible] দেবতার চরণে মস্তক রাখিয়া তিনি তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] হইলে কি হয়? যে কলঙ্ক অভাগিনী একবার অর্জ্জন করিয়া- ছিল ত[illegible] মার্জ্জনা কোথায়? যজ্ঞপতি বাবু ভাগলপুরে কার্য্য করিতেন এবং [illegible] [illegible]বন্ধনাতেই তিনি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। পাছে দেশে আসি[illegible] স্ত্রীর মনোবেদনার ও নিন্দার কোন কারণ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি আর দেশে ফিরেন নাই। দুই মেয়েরই বিবাহ তিনি ভাগলপুর হইতে দিয়াছিলেন। সেই জন্যই কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

বিবাহের মাস ছয়েক পরে তিনি গোপনে জামাতা হরপ্রসাদকে এই কুৎসার কথা বলিয়াছিলেন। এবং তাহা [illegible]

উপর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছিল, ইহা দেখিয়া তিনি বড় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং কি একটা বেদনাবিদ্ধ আনন্দে তাঁহার চ সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সংবাদ যদুনাথবাবুর সমাজপতিত্বে ভীষণ একটা আঘাত করিল প্রতিবেশীরা এবার সাহস করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইল তিনিও দেখিলেন, সমাজপতি হইয়া এ বিষয়ে নীরব থাকা তাঁহার কিছুতে কর্ত্তব্য নহে। সকলের পরামর্শ মতে স্থির হইল, বধূকে পরিত্যা করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। রূপে গুণে সর্ব্বাংশে কার্ত্তিক মত অমন ছেলের আবার বিবাহের ভাবনা কি? গ্রামে বিবাহের ক পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল।

পুত্র তখন কলিকাতায়। তিনি তাহাকে 'বিশেষ প্রয়োজনঃ' দুই দিনের ছুটী লইয়া আসিতে লিখিলেন। যোগমায়া সেইদিনতে শ্বশুরের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন এবং শ্বশুরের অ ও তাহার কারণ অবগত হইয়া, বুদ্ধিমতী হইয়াও একেবারে ভাঙ্গিয়া ন। স্বামীর ভালবাসায় তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু বাঁধিতে পারিলেন না।

পর দিন হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর বিবর্ণ জীর্ণ মু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, তি মায়ের কলঙ্কের কথা বলিতে গিয়া অর্দ্ধপথে কাঁদিয়া স্বামীর পা দুটি জড়াইয়া ধরিলেন। হরপ্রসাদ পিতার আহ্বানের কারণ তখনই বুঝিলেন। পায়ের কাছ হইতে স্ত্রীকে সস্নেহে তুলিয়া তাহার অশ্রুমলিন মুখখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ও তো কিছুই নয়। তুমি আমাকে এমনি ভাব যে আমি তোমাকে ত্যাগ করব? ছিঃ, চুপ কর।" বলিয়া অশ্রু

স্বামীর বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া, এমন দেবোপম স্বামীর প্রেমে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করিয়াছিলেন ভাবিয়া যোগমায়া লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অশ্রুধারায় কৃতজ্ঞতার সকল কথাই ভাসিয়া গেল।

এমন সময় পিতার আহ্বান আসিল। হরপ্রসাদ যোগমায়াকে আশ্বাস দিয়া পিতার নিকটে গেলেন। যোগমায়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিলেন।

যদুনাথ তখন অন্তঃপুরে আপনার শয়নকক্ষে বসিয়াছিলেন। কক্ষটী সুপ্রশস্ত। চারিটী দেওয়ালে চারিটী হরিণের শিংয়ের ব্রাকেট। মেঝেতে বিস্তৃত একখানি সুবৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন তাঁহার জীবনের বনপর্ব্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আহারান্তে দিবানিদ্রা ভঙ্গে তিনি পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া এইমাত্র পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। পালঙ্কের উপর শয্যায় বসিয়া তিনি পুত্রের অপেক্ষা করিতেছেন।

দাসী আসিয়া তামাক দিয়া গেল। নিদ্রাজড়িত স্বরে যদুনাথ বলিলেন, "রঙ্গ, দুটো পাণ দিয়ে যা তো। রঙ্গ বা রঙ্গিণী গোটা ছয়েক পাণ আনিয়া ডিবায় রাখিয়া গেল। এমন সময় হরপ্রসাদ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পিতাকে প্রণাম করিয়া হরপ্রসাদ পিতার সম্মুখস্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই যদুনাথ সংক্ষেপে বধূমাতার জননীর কলঙ্কের কথা বলিলেন। তার পর, আপনার কলঙ্কলেশশূন্য বংশ মর্য্যাদার কথা পুত্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"এক্ষেত্রে বধূকে ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তুমি কালই ওকে ভাগলপুরে রেখে এস। এর জন্যে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়োনা, এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে উচ্চ বংশের বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেবো।"

হরপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আপনি যা

শুনেছেন তা সবটা যদি সত্যও হয়, তাহলেও কি এ কাযটা উচিত ওর এতে কি দোষ ?”

পুত্র যে এক কথায় পত্নীত্যাগে রাজী হইবে, ইহা অবশ্য য ভাবেন নাই। তাই পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, “দেখ হর, এ দোষ কথা হচ্চে না। এ হচ্চে বংশমর্য্যাদার কথা। আগুনে হাত ই দিলেও পোড়ে, অনিচ্ছায় দিলেও পোড়ে, এ কথা মান ত ?”

শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধে হরপ্রসাদের কিছু বলিবার থাকিলেও তিনি বলিলেন, “শুনেছি শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্য একেবারে বে গিয়াছে। তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন বলে বোধ হয় না। তাঁর অ মানে অরক্ষিত অবস্থায় আপনার পুত্রবধূ সেখানে থাকলে অপমান হবে ন বংশমর্য্যাদায় আঘাত লাগবে না ?”

যদুনাথ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “যাকে আমি মন্দ ভেবে প ত্যাগ করছি, তার অধোরে কি হবে সে সব তো আমার ভাবার দরক নেই। এমন মেয়ে যে এতদিন ঈশ্বরা বাঁড়ুয্যের বংশে থাকতে পেরেছ এই তার ভাগ্যি। তোমার শ্বশুর তো আমার সঙ্গে জুয়োচুরী করে আমা উচ্চ মাথা হেঁট করাবার উপক্রম করেছিলেন।”

হরপ্রসাদ পিতার পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, “বিবাহের কিছু পরেই তিনি সব কথা আমাকে বলেছিলেন। সেটা, আপনি যা বলেছেন অতখানি নয়, সামান্য একটু অন্যায়—আর এরি জন্য তিনি সারাজীবন অনুতাপ করেছিলেন।”

শ্লেষের সহিত যদুনাথ বলিলেন, “সামান্য একটু অন্যায় বটে! তুমি তাহলে সব জেনেও কোন প্রতিবিধান করনি ?”

পুত্র নিরুত্তরে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। এবার ক্রোধের সহিত যদুনাথ বলিলেন, “যাক্‌, সে সব যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন

তোমার উদ্দেশ্য কি তাই বল। বউকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ ত ?"

হরপ্রসাদ এবার বিনীত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আপনি যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন, তাঁকে বিনা দোষে আমি কি করে ত্যাগ করবো বলুন ? আমায় ক্ষমা করবেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য যদুনাথের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পুরাতন খেলনার পরিবর্ত্তে নূতন খেলনা পাইলে শিশুরা তাহা লুফিয়া নেয়; আর ইহার না হয় একটু বেশী বয়স হইয়াছে—তাই বলিয়া কি একেবারে পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে ? যদুনাথ চেষ্টা করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, এইবার শেষ কথা তোমাকে বলব।" সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরপ্রসাদও পিতার অনুগমন করিলেন।

সে কক্ষে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা বড় লোহার সিন্দুক ছিল। আলমারী হইতে চাবি লইয়া যদুনাথ সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে এক খানি পুরু ও বড় কাগজের খাম বাহির করিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। তার পর একে একে ৪০ খানি কোম্পানীর কাগজ তাহার ভিতর হইতে বাহির করিলেন। সবগুলিই এক হাজার টাকার। পুত্রকে সেগুলি দেখাইয়া যদুনাথ বলিলেন, "দেখ হর, ৪০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ তুমি দেখলে। হাতে খাটানোর জন্যেও ১০।১৫ হাজার টাকা আমার আছে জান। এ ছাড়া বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে তাও তোমার অবিদিত নেই। আমি অবর্ত্তমানে, আমার শ্রাদ্ধাদির খরচ বাদ দিলেও, তোমাদের দুই ভায়ের এক এক অংশে সবশুদ্ধ হাজার পঁচিশ ত্রিশ পড়বে, এটা বুঝতে পারছ। কিন্তু যদি আমার অবাধ্য হও, এর একটা কাণা কড়িও পাবে না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি বল।"

মুহূর্ত্তের জন্য হরপ্রসাদের মুখে একট তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ছায়া পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "আপনি যদি একটা উচিত আদেশ করতেন, খুব শক্ত হলেও আপনার মুখের কথাতেই আমি তা করতাম, আপনার টাকার লোভে নয়। আপনি আমাদের বংশকে উচ্চ বংশ বলছেন, আমি সেই উচ্চ বংশেরই মর্য্যাদা রাখবো—টাকার লোভে অধর্ম্ম করব না।"

উচ্চ কণ্ঠে যদুনাথ কহিলেন, "তুমি তা হলে ঐ ছোটলোকের মেয়েকে ত্যাগ করবে না?"

পুত্র স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমার ক্ষমা করবেন।"

ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া যদুনাথ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তা হলে এই দণ্ডে তোমরা তুজনে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। এখনি যাও—আর যেন কখনও তোমাদের মুখ আমায় দেখতে না হয়।"

এবার হরপ্রসাদের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাঁহাদের মা নাই বলিয়া এত সহজে পিতা দূর হও কথাটা বলিতে পারিলেন। মা থাকলে—

প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুরোধ করিয়া হরপ্রসাদ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বপরিচয়—ক্ষণিকের মিলন

সে রাত্রেই বড় অভিমানে হরপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যদুনাথের বন্ধু ও আত্মীয়মণ্ডলী সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "ইহা াজি শিক্ষারই কুফল।" যদুনাথও সে বিষয়ে সকলের সহিত একমত লেন এবং নিজ পুত্রের গৃহত্যাগের পরদিনই তিনি কনিষ্ঠ শিবপ্রসাদকে ছাড়াইয়া দিলেন। তাহাকে বলিলেন, "তুমি ঘরে বসে ব্যবসা ইত্যাদি যকর্ম্ম শেখ, তোমার আর পড়তে হবে না।" শিবপ্রসাদ সেবার প্রথম ণীতে উঠিয়াছিল; একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়াছিল যে একবৎসর পরে ীক্ষাটা দিয়াই ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় না? কিন্তু তাহার সে আপত্তি ক নাই।

হরপ্রসাদ স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সেইরাত্রে এক বন্ধুগৃহে ঠিয়াছিলেন। তাহার পরে এক খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে াকেন। একবৎসর ৩।৪ যায়গায় ছেলে পড়াইয়া অতি কষ্টে আপনাদের াসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই এক ত্র ভূমিষ্ঠ হয়—সেই পুত্রের নাম শরৎচন্দ্র। পিতা বিমুখ হইলেও হর-প্রসাদ যথাসময়ে তাঁহাকে আপনার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা ও পুত্রলাভের ংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। যদুনাথ কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিতে করিতে ৪।৫ মাস পরে হরপ্রসাদ লাভপুর ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

মাসে একখানি করিয়া পত্র তিনি পিতাকে লিখিয়া তাঁহাদের কুশ জিজ্ঞাসা করিতেন; পিতা নিরুত্তর রহিতেন। তখন তিনি কখন শি প্রসাদকে কখন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে পত্র লিখিয়া বাড়ীর সংবাদ গ্রহ করিতেন।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন হরপ্রসাদ স্কুলে কায করিতেছেন, এমন সময় একখা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাইলেন। শিবপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "বাবা অত্যা পীড়িত। সপরিবারে শীঘ্র আসুন, বাবা দেখিতে চাহিয়াছেন।"

সেই দিনই সেক্রেটারির নিকট এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া তিনি লাভপু পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপর দিবস বাড়ী পৌছিলেন।

আসিয়া দেখিলেন পিতার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাগত—৮।১০ দিন অতীত হইলে তবে তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন!

দীর্ঘ ৬।৭ বৎসরের পরে যখন হরপ্রসাদ পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপরাধীর মত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, যদুনাথের তখন বাক্‌শক্তি ছিল না। বহুকাল পরে নির্বাসিত পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আর ৩০দিন পরে যদুনাথের বাঁচিবার আশা হইল। হরপ্রসাদ এই একমাসকাল প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রাণপণ করিয়া দিনরাত্রি পিতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। যোগমায়াও যথাসাধ্য স্বামীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদকে ডাক্তার ডাকা পথ্য যোগাড় ইত্যাদি বাহিরের কার্য্য লইয়া থাকিতে হইত। যে দুজন ডাক্তার দেখিতেছিলেন তাঁহারা একবাক্যে হরপ্রসাদের শুশ্রূষার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ যাত্রা আপনি হরপ্রসাদের শুশ্রূষার গুণেই রক্ষা পাইয়াছেন, টাইফয়েডে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষার বেশী দরকার।"

কটি ঘর লইয়া নির্জ্জন কারাবাসের মতই সেখানে থাকিতে লাগিলেন।
ানি তো বিনাপরাধে শ্বশুরের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; একমাত্র
ুত্র যাহাতে পিতামহের স্নেহরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত না হয় সে জন্য তিনি
ুত্রকেও বড় একটা কাছে রাখিতেন না। শরৎ পিতামহের কাছেই
াইত, রাত্রে শয়নের সময় মার কাছে আসিত।

এইরূপে দশবৎসর কাটিয়া গেল। শরতের বয়স ষোড়শবৎসর হইল,
এবং সে সেইবার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পিতামহ সেইবারই
ুব সমারোহ করিয়া সেই গ্রামের অন্যতম জমীদারের কন্যার সহিত পৌত্রের
বিবাহ দিলেন। যোগমায়ার মতাদি স্বামীর মতানুযায়ী গঠিত হইয়াছিল,
সুতরাং পুত্রের বাল্যবিবাহে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে পুত্র
বাবার পিতামহের বিরাগভাজন হয়, এই আশঙ্কায় তিন কোন আপত্তিই
করেন নাই।

এই অবসরেই অনেক দিনের দাসী রঙ্গিণীর মৃত্যু হয়। ইহার আঘাতটাও
যদুনাথের কিছু লাগিয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহারও দিন শেষ
হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে কোন গোলযোগ বাধে, এই
ভাবিয়া তিনি সত্বর এক উইল করিলেন। ভাবনার কারণও ছিল।
কারণ, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদকে এমনই বিষয়ী করিয়া তুলিয়া-
ছিলেন যে, তাহার লোভের আর অন্ত ছিল না। দাদা যে পিতার বিষয়ের
ও অর্থের কোন অংশই পাইবেন না, এই বিশ্বাসই তাহার জন্মিয়াছিল, এবং
বোধ হয় সেই জন্যই সে শরৎকে স্নেহচক্ষে দেখিত না। বিচক্ষণ যদুনাথ
এ সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি উইলে ব্যবস্থা করিলেন যে,
তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় হইবে ১০০০৲ টাকা, পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থ স্থানীয় স্কুলে
২০০০৲ ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে কলেরা চিকিৎসার সৌকর্য্যার্থ ১০০০৲
দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া যাহা থাকিল তাহা সমান দুই অংশে বিভক্ত

হইবে ;—একভাগ পাইবে তাঁহার পৌত্র শরৎচন্দ্র, অপর ভাগ পাই তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদ।

উইল করিয়া কয়েকমাস পরেই যদুনাথ প্রাণত্যাগ করিলেন। শিব প্রসাদ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিষয়াদি ভাগ করিয়া লইলেন বাসভবন দুইখণ্ডে বিভক্ত হইল। একখণ্ডে তিনি থাকিলেন। অপ খণ্ডে যোগমায়া পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগমায় দেবরকে তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবর শ্লেষের সহিত বলিয়াছিল—তোমার ভিতর যথেষ্টই পুরুষত্ব আছে, তোমায় অভিভাবকের দরকার নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনন্দের বেদনা

অপরাহ্ণে জমীদার অতুলকৃষ্ণ একখানি টেলিগ্রাম হস্তে অন্তঃপুরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একটি পরিচারিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সদু, উনি কোথায় গেলেন?" সদু তখন কর্ত্তার ঘর ঝাঁট্ দিতেছিল। কর্ত্তাকে দেখিয়া শশব্যস্তে ঝাঁটা রাখিয়া বলিল, "মা বোধ হয় ভাঁড়ার ঘরে আছেন, ডেকে দিই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

অতুলকৃষ্ণ সুপুরুষ; বর্ণ সুগৌর, ও আকৃতি দীর্ঘ। বয়স এখনও পঞ্চাশ পার হয় নাই। পরিচ্ছদের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই। পাঠ্যাবস্থায় তিনি "সংযম সভা"র সম্পাদক ছিলেন। আহারাদি বেশভূষা ইত্যাদি সকল বিষয়েই সংযম রক্ষা তাঁহাদের সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের সমিতির পরিচ্ছদ ছিল টুইলের একটি সার্ট, সরুপাড় ধুতি ও ক্যাম্বিসের জুতা। শীতকালে সাদা মোজা ও গায়ে কামিজের উপর একটি কোট উঠিত। এখন পর্য্যন্তও সেই ব্যবস্থাই প্রায় বজায় আছে। কেবল গ্রীষ্মকালে উড়ানি ও শীতকালে কোন একটা শীতবস্ত্র বাড়িয়াছিল। পাণ, চুরুট ইত্যাদি সেই হইতেই পরিত্যজ্যই আছে। আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যাদির জন্য কখন তিনি ভৃত্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন না। অনেক জমিদার-সন্তানদিগকে দেখা যায়, তাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চি— বাবুদের তেল মাখানো, স্নান করাইয়া দেওয়া, স্নানান্তে

বদলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যও ভৃত্যের দ্বারা হাস্যোদ্দীপক ভাবেঃ সম্পাদিত হয়।

অতুলকৃষ্ণ এ সমস্ত অভ্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বাবলম্বন বড়ই ভালবাসিতেন এবং একমাত্র পুত্রটির চরিত্র ও অভ্যাস তাঁহারই মতানুযায়ী গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী দেবীও স্বামীর অনুরূপা পত্নী। তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে স্বামী পুত্র ও সকলের জন্য রন্ধন করিতেন; দাস দাসী ও অভ্যাগত আত্মীয়দিগের পাকের জন্য পাচক নিযুক্ত ছিল। তাহার ব্যবস্থাও তিনি স্বয়ং করিয়া দিতেন। পত্নীর এই অভ্যাস মনে মনে ভালবাসিলেও অতুলকৃষ্ণ প্রথম প্রথম বলিয়াছিলেন—"কেন তুমি নিজে ওসব রাঁধ? রাঁধবার লোক তো রয়েছে।" সরস্বতী দেবী উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি যদি জমিদারের ছেলে এবং নিজে জমিদার হয়েও নিজের কায নিজে করতে পার, তখন গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে আমি নিজের কায নিজে করতে পার না কেন?" বলা বাহুল্য, স্ত্রীর এই উত্তর ও ব্যবহার অতুলকৃষ্ণকে বড়ই সুখী করিয়াছিল।

পরিচারিকা যাওয়ার একটু পরেই সরস্বতী দেবী হাস্যমুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা উনিকে কি জন্য ডেকেছ?"

সরস্বতী দেবী তেমন রূপসী নহেন, কারণ বর্ণ তাঁহার শ্যাম। তবে তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর শ্যামল শ্রী অঙ্গের গৌরবর্ণের অভাব দূর করিয়াছিল। সেই স্বচ্ছ পরিপূর্ণ সরোবরের মত চক্ষু দুটি দিয়া তাঁহার শুভ্র উদার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখা যাইত। মুখে এমন একটি কোমল শান্তভাব মাখান ছিল, যাহা দেখিলে সমস্ত রূঢ়তা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িত।

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সদুর কাছ থেকে সেটুকুও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে? তোমার এ স্বভাবটি কিন্তু গেল না এখনও।"

"তোমাকে এত করে বলেও তোমার উনি বলা স্বভাবটা কিন্তু গেলনা। াকে আবার উনি বলা কেন ?"

"অন্য লোকের সামনে যদি বলি 'ও কোথায় গেল,' সেটা কি রকম শ্রী শোনায় বল দেখি ? আমার সম্বন্ধে কথা বলবার সময় তুমি তাহলে বলনা কেন ?"

"বেশ ! আমি আর তুমি ! আমি হলাম—"

"দাসী, এই ত ?"

"তা সেটা কি মিথ্যে ?"

"খুব সত্যি, তা কত করে মাইনে ?"

সরস্বতী মনে মনে বলিলেন, আমি তোমার বিনামূল্যের দাসী। মুখে ছু বলিলেন না ; শুধু আপনাকে স্বামিপ্রেমে অসীম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান রিয়া স্বামীর প্রফুল্ল মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে এমন কটি স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিল যে, অতুলকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখখানি াছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। সরস্বতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই তিনি একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ও কি, কেউ এসে ়ড়ে যদি, এখনও ছেলেমানুষি !"

"ঐ তো তোমার দোষ। তুমি আমাকে একেবারে বুড়ো না করে ছাড়বে না দেখ্ছি। মোটে ৪৫ বছর বয়সে কি করে বুড়ো হই বল দেখি ? আচ্ছা, সে সব দিনের কথা বুঝি আর মনে পড়ে না, যখন এমনটি না হলে অভিমানে চোখে জল আস্ত ? আর এখন ছেলে এসে পড়্বে, ঝিরা কেউ দেখে ফেলবে, কতই আপত্তি ! সত্যি বলছি, আমার তো মনে হয় সে সব কালকের কথা ! আমার বাইরেটার যত বয়স হয়েছে, ভিতরটা বোধ হয় তার চেয়ে ঢের কাঁচা আছে নয় ?"

সরস্বতী প্রসন্নমুখে বলিলেন "তোমার বাইরেটাও এখনও তে
সুন্দর আছে।"

"আর তোমার বুঝি ভারি অসুন্দর হয়ে গিয়েছে? চোখ দুটি একব
আয়না নিয়ে দেখ দেখি।"

এই কথায় লজ্জিত হইয়া সরস্বতী কথা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা কি
লেন, "তা, কি জন্য ডাকছিলে বললে না?"

অতুলকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে টেলিগ্রামটি বাহির করিয়া বলিলেন
"সুখবর আছে। অশোক 'ফাষ্ট ডিভিসনে' পাশ হয়েছে, এই দে
টেলিগ্রাম।"

সরস্বতীর মুখে চোখে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে স্বামীর
হাত হইতে টেলিগ্রামটী লইয়া পাঠ করিলেন। স্বামীর নিকট তিনি
মোটামুটি রকম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

"আহা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুমি একবার অ কে ডেকে
পাঠাও। সে বোধ হয় শরতের কাছে আছে। আমি এখনি ঠাকুরবাড়ীতে
পুজো পাঠিয়ে দিই গে। আহা বাছা এগ্জামিনের সময় রোগা
হয়ে গিয়েছিলো। মা দুর্গা পরিশ্রম সার্থক করেছেন ভাল।"—
বলিতে বলিতে পুত্রের কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া সর দেবী শুভ
সংবাদটি সকলকে বলিবার জন্য ও পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহির
হইলেন। অতুলকৃষ্ণও বহির্বাটীতে আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে পূজা পাঠাইয়া দিয়া সরস্বতী দেবী প্রসন্নমুখে পুরনারী-
দের সহিত পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন।

সদু বলিল—"তা মা, এখন কেন দাদা বাবুর বিয়ে দাওনা?"

সরস্বতী দেবী বলিলেন, "আমার তো ইচ্ছে করে মা, কিন্তু ওঁর ইচ্ছে
লেখাপড়া শেষ হলে বিয়ে দেবেন।"

সহ একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি বাবুকে জোর করে বল তা হলে
ন খুব শোনেন।"

সরস্বতী দেবী ঈষৎ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "তা কি বল্‌তে আছে মা?
কাল ওঁরই মতে চলে এসেছি, আজ কি অন্যপথে যেতে পারি? আর
নি তো ছেলের ভালর জন্যেই বল্‌ছেন।"

এমন সময় অশোক হাসিমুখে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের
লা লইল। পুত্রের হাসিমুখ ও প্রণাম হইতেই সরস্বতী দেবী বুঝিলেন,
ত্র পিতার নিকট হইতে পাসের সংবাদ পাইয়াই আসিয়াছে। তিনি
ত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বিদ্যায় বৃহস্পতি হও বাছা,
রোগ হয়ে বেঁচে থাক, রাজা হও।"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি ভাল লেখাপড়া জেনেও শেষে আশীর্ব্বাদের
জায় ভুল কর্‌লে। রাজা কি করে হব বল? আজকাল তো আর
আগেকার মত পাগলা হাতী ঘুরে বেড়ায় না যে, শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলি নিয়ে
বে, আর শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেবে।"

সরস্বতী দেবী মুগ্ধচিত্তে পুত্রের সুন্দর হাসিমুখখানির পানে চাহিয়া
লিলেন, "তোর বাপু সব কথাতেই ঠাট্টা, তা কি কর্‌ব? রাজা মানে কি
আর সত্যি সত্যিই রাজা? এই খুব বাড়বাড়ন্ত, সুনাম এই সব। তা
াক্‌, এতক্ষণ যে তোকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছিলাম। সেই
পুর বেলা বের হয়েছিলি, আর এই প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এলি।
কোথায় ছিলি বল দিকি, শরৎদের বাড়ী বুঝি?"

শরতের কথা উঠিতেই অশোকের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তাহার
মনে হইল, শরৎ ও সে এক সঙ্গেই প্রথম হইতে পাস করিয়া আই-এ
পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গত ছয়মাস হইতে শরৎ রোগে শয্যাগত
হইয়া আছে, তা না হইলে তো একসঙ্গে আই-এ পাস করিবার কথা।

অশোক বিষণ্ণমুখে বলিল—"হাঁ মা, শরতের কাছেই এতক্ষ ছিলাম। তারও এবার পাস হবার কথা, তা অসুখে এগ্‌জামিন দি পারলে না। এখন বাঁচে কি না সন্দেহ। সন্দেহই বা কেন। ডাক্ত তো এক রকম বলেই দিয়েছে বাঁচবার আশা নেই। আহা খুড়িমার অ চক্ষের জলের বিরাম নেই। তবু এমন সহিষ্ণুতা মা, যে শরতের সাম একটা জোরে নিশ্বাসও ফেলেন না।"

বন্ধু ও বন্ধুজননীর দুঃখে অশোকের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সরস্বত দেবীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "আহা, ঐ একটিমাত্র ছেলে শিব রাত্তিরের সল্‌তে, মা দুর্গা যেন রক্ষে করেন।"

অশোক বলিল—"সত্যি মা, শরতের অসুখের জন্যে আমার পাসে আনন্দের অর্দ্ধেকও নেই। পাসের খবরটাই শরতকে দিতে আমার লজ্জা করবে। সে কিন্তু আজও জিজ্ঞাসা করেছে আমার পাসের খবর বেরিয়েছে কি না। আর বল্‌ছিল, যদি দৈবাৎ বেঁচেও যাই, তা হলে আর দুজনে এক সঙ্গে পড়তে পাব না। কথাটা শুনে এত কষ্ট হল মা! মনে মনে ভাবলাম—এবার যদি ফেল হই তা হলে দুঃখ নেই—দুজনে আবার একসঙ্গে পড়তে পাব।"

দুঃখের প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য মা বলিলেন, "ও কথা ভেবে আর কি করবে বল? উপায় ত নেই, হাত পা বেশ করে' ধুয়ে, তসরের কাপড়খানা পরে' আমার সঙ্গে আয় ত একবার। নারায়ণের পূজো দিতে হবে।"

পুত্র মায়ের কথানুসারে হাত পা ধুইতে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতৃহৃদয়

তাহার পর দিন ভোরের বেলাই মেঘ করিয়াছিল। শেষরাত্রে বেশ পশলা জল হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নও পথে ঘাটে রহিয়াছে। ৭টা তেই মাতার নিকট জলযোগ শেষ করিয়া অশোক একটু চিন্তিত মনে ংদের বাড়ী চলিল। আকাশে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্য লেও তাহার আভাটুকু লুপ্ত হয় নাই। মেঘান্তরিত দিবাকরের মত, শাকের কৃতকার্য্যতার আনন্দটুকুও বন্ধুর রোগচিন্তায় ম্লান হইয়া ড়য়াছিল।

শরৎদের বাড়ী পৌঁছিয়াই অশোক দেখিল, যোগমায়া রন্ধন আরম্ভ রিয়া দিয়াছেন। অশোককে দেখিয়াই তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া ঠল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ অশোক, তোমার পাসের খবর াল এসেছে শুনলাম। কালই খবর দিয়ে পাঠাওনি কেন? শরৎ আজ কালে শুনে তোমার ওপর রাগ করেছে।"

অশোক কোন উত্তর না করিয়া ম্লানমুখে শুধু একটু লজ্জিত হাস্য রিয়া যোগমায়ার পদধূলি লইল।

যোগমায়া অশোকের গোপন ব্যথাটুকু বুঝিলেন। তাই তাহাকে াশীর্ব্বাদ করিয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন—"তার আর কি হবে বাবা, তবু তো ূমি পাস করেছ। এতেই তার কত আনন্দ। আজ ভোরে উঠেই খবর পেয়ে শরৎ বল্লে—'মা, আজ অশোককে এখানে খেতে বল, আর তোমার বোমাকেও নেমতন্ন করে' পাঠাও।' তাই সকালে সকালে উঠে রান্না

চড়িয়েছি। বৌমাকেও বলে পাঠিয়েছি। ভাব্‌লাম তুমি একা
আস্‌বেই, তাই তোমার কাছে এখনও খবর দিইনি।"

শরতের স্ত্রীর কথা উঠিতেই, বন্ধুর সহিত অশোকের গতকল্য যে
কথা হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী সুসঙ্গিনী যাঃ
মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার প্রতি অনুরক্তা হয়, এই জন্যই শরতের এই
তাহা অশোক বুঝিল। সে মনে মনে স্থির করিল, শরতের নিকট যাই
পূর্ব্বেই আজ খুড়িমার নিকট কল্যকার সেই কথা উত্থাপন করিবে।

নূতন জিনিষ কি কি রান্না হইবে, শরতের স্ত্রী কখন আসিবে ইত
দুই চারিটি অন্য কথা কহিয়া অশোক বলিল—"খুড়িমা, একটা ক
তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব ভাবি, রোজই ভুলে যাই।"

যোগমায়া বলিলেন—"কি কথা বাবা?"

অশোক চট্ করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিল না। দেখি
পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিল, কথাটি উত্থাপন করা তাহা অপেক্ষা অনে
কঠিন। অথচ বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলে কথাটা আর
নির্দ্দয় রূঢ় ঠেকিবে। তাই কোন প্রকারে অশোক বলিয়া ফেলিল,
"শরতের শ্বশুর লোক তেমন ভাল নন্। তাই সাবধান হওয়ার জন্য
আপনার নামে সম্পত্তির একটা অংশ লেখাপড়া করে নিলে ভাল হয়।"

যোগমায়ার মুখের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণের জ
তাঁহার কথা কহিবার শক্তি লুপ্ত হইল। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া
অত্যন্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, ডাক্তার কি আ
একেবারেই আশা নেই বলেছে?"

মাতৃহৃদয়ে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে অনুমান করিয়া অশোক অত্য
অনুতপ্ত হইয়া বলিল,—"না খুড়িমা, ডাক্তার সে কথা কিছুই বলেননি
তবে রোগ ভাল নয় তা তো আপনি জানেন। সে জন্যে ভবিষ্যৎ ভে

করলে কোন ক্ষতি নেই, তাই বল্‌ছিলাম। শরতের মনটাও তাতে নিশ্চিন্ত থাকে। সেও সেদিন বলছিল এরকম কল্লে মন্দ হয় না।"

ীরে ধীরে যোগমায়ার মুখে একটা ম্লান গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল। লন, "তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ ভেবে ভালোর জন্যেই এ কথা বল্‌ছ আমি বুঝেছি। কিন্তু তাতে কিছু দরকার নেই। ভগবান না করুন, শরতের অভাবই সহ্য করতে হয়, তাহলে এমন কোন অভাব নেই আমার তখন সইবে না। অন্নবস্ত্রের অভাব দুদিন গেলে সয়ে যাবে। প্রাণ ধরে আমি আমার শরৎকে সে ব্যবস্থা করতে দিতে পারব না।"

অশোক বলিল—"শরৎ কিন্তু বল্‌ছিল—এতে তার মন আরও হাল্কা যাবে।"

যোগমায়া বলিলেন—"তোমার কাকা বল্‌তেন, 'আমি ভাল হব কোন নেই, এ বিশ্বাসটা রোগীর বড্ড দরকার। এ বিশ্বাস যাতে কমে, ন কোন কায করা কিছুতেই উচিত নয়। ও ভাবনাটাই শরতের মন ক একেবারে দূর করে দিতে হবে। তোমরা সবাই মিলে তাকে াস করিয়ে দাও, ও সব ব্যবস্থার কিছুই দরকার এখন নেই। আমার পালে যা থাকে থাক্‌, তাকে নির্ভরসা আমি কিছুতেই হতে দেব না!"

ইহার উত্তরে অশোক আর কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু নিঃস্বার্থ সুহৃদয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তাহার তরুণ হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"আপনার কথাই ঠিক খুড়িমা। আমি শরৎকে এই কথাই বুঝিয়ে দিগে।" বলিয়া অশোক উপরে শরতের নিকট গেল।

যোগমায়া কিছুক্ষণ রন্ধনগৃহের দুয়ারে উন্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আশাহত

শরৎ যখন স্ত্রীকে এক দিন আনিবার জন্য মার নিকট ইচ্ছা প্রক করিল, তখন সেই ইচ্ছার মূলে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার আগ্রহ ছ আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

মাত্র দুই বৎসর হইল সুসঙ্গিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াে তাহার মধ্যে অধিকাংশ কালই সে কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়াে অবকাশকালে যখন বাড়ী যায়, শ্বশুরগৃহে তাহার সহিত সাক্ষাতে প পরিচয়ে যে সমবেদনা ও নির্ভরতা সৃজিত হইয়া উঠিয়াছিল, রোগশয গ্রহণ ও দূরাবস্থানে তাহা ধীরে ধীরে অসমাপ্ত ও পরিত্যক্ত-নির্ম্মাণ মূর্তির গৃহের মত ভগ্ন ও শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। বেশী দিন বধূর অদর্শনে পু মনে ব্যথা পাইবে ইহা বুঝিয়া, দিবাভাগে মাঝে মাঝে যোগমায়া তাহাকে বাড়ীতে আনাইয়া মায়ের স্নেহে তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সন্ধ্যা সময় পিতৃগৃহে পৌঁছাইয়া দিতেন। তাঁহার মনে ইচ্ছা ছিল বধূমাতাকে কিছুদিনের জন্য নিজের কাছেই রাখেন, কিন্তু বৈবাহিকের কঠিন নিষেধের জন্য তাহা করেন না।

মাঝে মাঝে সুসঙ্গিনীকে দেখিয়া শরতের মন একটু শান্ত হইত, কিন্তু সুসঙ্গিনী মনকে অত সহজে শান্ত করিতে পারিত না। তাহার যৌবনোন্মেষিত চিত্ত স্বামিগৃহেই থাকিতে চাহিত। না হয় স্বামীর কাছে অধিকক্ষণ নাই থাকিবে। স্বামীর গৃহে থাকিলে তাঁহার কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পিত

চ তাহা সে জানিত, কিন্তু শাশুড়ী যদি অভিভাবিকার মত জোর
য়া বলিতেন, না আমার বৌমা আমার কাছে থাকিবেন, তাহার
দ্ধে তাহার পিতা কি কিছু বলিতে পারিতেন? শাশুড়ীর হৃদয় না হয়
তার দুঃখে না কাঁদিতে পারে; কিন্তু স্বামী—তিনিও কি একবার
তে পারেন না—আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আনিয়া রাখ? মেয়েকে
ন শ্বশুরবাড়ী পাঠান হয় না ইত্যাদি দুই চারিটি কথা যখনি সে
ত, তখন পিতা, মাতা, স্বামী, শাশুড়ী ও সর্বোপরি চিকিৎসা শাস্ত্রটার
র একটা বিষম ক্রোধে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। নারী-
টা কি এতই অসার? তাহার মধ্যে বুদ্ধি, বল বলিয়া কি কোন
র্থই নাই? ওসব কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িত।
চ একবার মনে করিত যে সে জোর করিয়া স্বামীর কাছে চলিয়া
ইবে, কেন সে অপরের নিকট হইতে এই অপমান ও অবিচার সহ্য
রবে? কিন্তু সেখান হইতে যে কোন আহ্বানই আসে না! কিসের
রে সে যায়?

সুসঙ্গিনীর যে কঠিন হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়াছিল, তাহার মূলে এই
দ্বেগ, মনঃক্ষোভ ও উত্তেজনা ছিল—যাহা শারীরিক রোগের চিকিৎসকগণ
রণ না করিতে পারিলেও, প্রকৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের অজ্ঞাত
ত না।

স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ হইলে সমস্ত সংকোচ কাটিয়া
ত। সুসঙ্গিনী অনায়াসেই স্বামীকে বলিতে পারিত, আমি তোমার
নেই থাকিব, তুমি আমাকে এখানে আনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কর।
ন্তু সংকোচ ও অভিমান ইহার অন্তরায় হইয়াছিল।

সুসঙ্গিনী যে এখানে আসিবার জন্য অতখানি ব্যগ্র তাহা শরৎ বুঝিতে
ারে নাই। কত আশা ও কত আকাঙ্ক্ষা, পাখীর মত, এই তরুণ

বয়সে যাহার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহাকে শুধু রুগ্ন স্বামীর সেবার জন্ম কাছে রাখিতে তাহার বলিষ্ঠ অথচ স্নেহ-প্রবণ প্রাণ চাহিত না। কিন্তু দূর হইতে সমুদ্র-গর্জ্জনের মত মৃত্যুর একটা গম্ভীরধ্বনি, সেখানকার বায়ু-স্রোতের মত একটা শীতল স্পর্শ যেন সে অনুভব করিতে-ছিল। তাই সংসারের সকলের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া, সকলেরই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবার জন্ম সে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। বিষয়ের একটা অংশ লেখাপড়া করিয়া লইতে মায়ের যখন নিতান্ত অনিচ্ছা শরৎ বুঝিতে পারিল, তখন তাহার এই ইচ্ছা প্রবল হইয়া পড়িল যে, জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট মেয়াদটুকুর মধ্যে সে স্ত্রী ও মায়ের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী স্নেহের বন্ধন রচিত করিয়া দিয়া যাইবে। মা যাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্ম দুটি ব্যাকুল বাহু তুলিয়া আছেন—সে কি তাহার মাঝে আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিবে না? শরতের বিশ্বাস ছিল যে, সুসঙ্গিনী যদি মায়ের দিকে থাকে, তাহা হইলে তাহার শ্বশুর মায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবেন না।

আজ যোগমায়া যখন তাঁহার এক দেবরপুত্রের সঙ্গে ঝিকে দিয়া সুসঙ্গিনীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাহার মনে [illegible]মটা একটু প্রকাণ্ড "না" ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। ইচ্ছা [illegible]ছিল এবার বেশ জোর গলায় বলে—'না আমি যাইব না—তো[illegible]দের যখন [illegible]চ্ছা হইবে আমাকে দয়া করিয়া খানিকক্ষণের জন্ম ডাকিয়া লইয়া যাই— আমি তোমাদের সে দয়া আর লইব না।'

কিন্তু মানুষ যত কথা বলিবে এবং যত কায করিবে বলিয়া [illegible] রাখে, তাহার কয়টা পারে? ক্রুদ্ধ অভিমানের প্রথম বেগটা কমিয়া সে ভাবিয়াছিল, কোন একটা ওজর করিয়া সে আজ যাওয়া বন্ধ [illegible] তাহার পিতামাতাও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে একমাস [illegible]

পরে কন্যাকে একবার স্বামিগৃহে যাইতে দিয়া তাঁহারা একেবারে অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখান নাই। কিন্তু সেই নির্জ্জন কক্ষের রোগ শয্যায় শায়িত সেই দুর্ব্বল অথচ আত্মনির্ভরশীল শীর্ণ যুবকটির ম্লান স্নেহভরা দৃষ্টি স্মরণ করিয়া, সে দুইটি কার্য্যের কোনটিই করিতে পারিল না। শুধু কন্যাত্বের গণ্ডীটুকু পার হইয়া কম্পিত হৃদয়ে বধূত্বের সীমারেখায় পৌছাইবার জন্য আপনার অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ঝিয়ের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল।

সুসঙ্গিনী আসিয়া প্রণাম করিতেই, যোগমায়া যখন তাহাকে 'সাবিত্রী সমান হও, হাতের লোহা বজ্র হোক, চিরকাল মনের সুখে থাক' ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ করিয়া, 'এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী এস! বলিয়া পরম স্নেহে তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন, তখন সুসঙ্গিনী অতিকষ্টে অশ্রু দমন করিয়া নত নেত্রে দাঁড়াইল। যোগমায়ার মনে শুধু এই কথাটি জাগিতেছিল গত জন্মে না জানি কত পাপ করিয়াছি, তাই বুঝি এজন্মে পুত্র পুত্রবধু লইয়া মনের সাধে ঘর করিতে পারিলাম না!

সুসঙ্গিনী যখন আসিল, তখন বেলা এগারটা। অশোক তখন শরতের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। সুসঙ্গিনী শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাত পা ধুইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

অশোককে শরতের ঘরে বসাইয়া সযত্নে খাওয়াইয়া, যোগমায়া পুত্রবধুর সম্মুখে থাকিয়া সস্নেহে তাহাকে আহার করিতে দিলেন। বহুদিন পরে কন্যা শ্বশুরালয় হইতে আসিলে মাতা যেমন তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, যোগমায়ার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। এই মায়ের মত স্নেহটুকু সুসঙ্গিনীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। একবার তাহার বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—"মা, আমাকে আর পাঠাইও না; আমি তোমার কাছেই থাকিব।"

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা মুখে আট্‌কাইয়া গেল। সাধারণ

বধূদিগের মত ত তাহার অবস্থা নহে! একথা শুনিয়া শাশুড়ী যদি কিছু মনে করেন!

অন্যান্য কাযকর্ম্ম সারিয়া নিজের আহার করিতে যোগমায়ার দুইটা বাজিয়া গেল। তাহার পরে তিনি সুসঙ্গিনীকে সস্নেহে বলিলেন—"এবার বৌমা শরতের কাছে একটু বস গে যাও।" বলিয়া তিনি অন্য একটি কার্য্যের নাম করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে সুসঙ্গিনী আসিয়া স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিল, শরৎ তখন আঙ্গুল দিয়া বন্ধকরা একখানি বই হাতে লইয়া পাশ ফিরিয়া জানালার দিকে চাহিয়া শুইয়াছিল।

পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল "এই যে, এসেছ! বসো আমি এখনই তোমারি কথা ভাবছিলাম।" বলিয়া শরৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

সুসঙ্গিনী তখনও তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরৎ করুণ স্বরে বলিল—"অনেক দিন পরে এলে; দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।"

সুসঙ্গিনী জড়সড় হইয়া শয্যার কাছটায় মেঝের উপর বসিল।" "উঠে বস" কথাটা বলিতে গিয়া শরতের মনে পড়িয়া গেল, তাহার রোগটা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন সুস্থ ব্যক্তির‌ই তাহার শয্যায় বেশীক্ষণ বসা উচিত নহে। তাই ঐ কথার পরিবর্ত্তে শরৎ বলিল— "শুধু মেঝেতে বোসো না, ওই যে আসনখানা পাতা রয়েছে ওইখানে বসো।"

"ওখানে কেন, বিছানায় উঠে বসো"—শুধু এই কথাটা হয়ত বা একটু হাতে ধরিয়া উঠানো—এই রকম একটা কিছু একটু বেশী মাত্রায় আশা করিয়া সুসঙ্গিনী মেঝের উপর বসিয়াছিল। তাই এই আসনের কথার আঘাতটা তাহাকে একটু বেশী করিয়াই লাগিল।

আসনের দিকে একবার না তাকাইয়াই, সুসঙ্গিনী স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"আমার শরীরে কি এতই বিষ যে বিছানার কাছে বসলেও তোমার অসুখ বাড়বে ? বিছানায় তো বসিনি।"

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জড়সড় ভাবটুকু কাটিয়া গিয়াছিল।

বেদনা ও বিস্ময়ে শরৎ খানিকটা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সুসঙ্গিনী কি শেষে এই ভাবিল? কিন্তু সেও তো সুসঙ্গিনীকে বিছানায় বসিতে বলে নাই, বিছানায় যে সে বসে তাহাও তো চাহে নাই। কিন্তু সে যে কি ভাবিয়া স্ত্রীকে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতে বলে নাই, তাহা তো এই সদ্য স্ফুটিত ফুলের মত পরিস্ফুট যৌবনশ্রীর মুখের উপর বলা যায় না।

তাই একটু পরে শরৎ অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলিল—"আমি তো তোমাকে ও কথা বলিনি।"

জবাবটা ঠিকমত হয় নাই। সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বরে যাহা ছিল কথায় তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

সুসঙ্গিনীর মনের ক্ষোভ তাহাতে দূর হইল না। কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেশ একটু জ্বালা রাখিয়াই সুসঙ্গিনী বলিল—"মনের সব কথা কি লোকে সবাইকে বলে ?"

বলিয়া সে শয্যা হইতে আর একটু সরিয়া বসিল।

শরৎ এই আঘাতে চঞ্চল হইয়া ব্যস্তভাবে সরিয়া আসিয়া, সুসঙ্গিনীর কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—'রাগ করো না সু—এস বিছানায় উঠে এস। আমি সত্য ও ভেবে বলিনি"—

শরৎ আরও দুই একটী কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুসঙ্গিনী বেগে আরও অনেকখানি সরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "থাক্ তোমার আর মায়া দেখাতে হবে না।" বলিয়া সে একেবারে ঘরের এক কোণে আসিয়া বসিল।

শরতের চোখে মুখে যে সামান্য রক্তটুকু ছিল, তাহাও যেন মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল। সে বুঝিল ইহা অভিমান। কিন্তু এই কি অভিমানের সময়?

কোথায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া দুই চারিটী কথা কহিবে, যাবার আগে বলিয়া যাইবে, মায়ের সঙ্গে যেন স্নেহের বন্ধনটী বজায় রাখে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে সংকোচ ছিল তাহা যদি কমিয়া যায়—তা নয় এ যে আরও ব্যবধান বাড়িয়া গেল!

তবু আর একবার চেষ্টা দেখিবার জন্য বলিল—"রাগ কোরো না সু। একটা কথা বলবার জন্যেই তোমাকে কত করে ডাকিয়ে এনেছি।"

বলিয়া আর একটু থামিয়া শরৎ বলিল,—"দেখ আমি বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—বাঁচবো না। ভগবান যে আমার হাত দিয়ে তোমাকে এমন দুঃখ দিলেন, আরও দুঃখ দেবেন, তাই ভেবে আমি কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। আর কি বল্‌বো, মাকে যেন কখন ভুল বুঝো না। যদি পার, মার কাছে এসেই থেক। যে কদিন থাকি, মাঝে মাঝে এখানে এসো। মার কথা..."

কথাটাকে সমাপ্ত হইতে না দিয়াই সুসঙ্গিনী চো[illegible] জলের মধ্যেও আগুন জ্বালিয়া বলিল— "আমি কেউ নই, মাই তোমার সব—তোমাদের দোহাই দিচ্ছি, আমাকে এখেনে এনে তোমরা আর দগ্ধে দগ্ধে মের না। আর আন্‌তে গেলে আমি আস্‌বই না।"

বলিয়া মুখে আঁচল দিয়া সুসঙ্গিনী সেখান হইতে সবেগে উঠিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে চিত্রার্পিতের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যায় ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া যোগমায়া যখন বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা অমন করে বসে কেন?" তখন শরতের যেন চমক ভাঙ্গিল। মনে

পড়িল, সুসজ্জিনী তো অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, আর কেন বসিয়া থাকা ?

মাকে বলিল,—"অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি মা, তাই শরীরটা যেন কি রকম কচ্চে।"

যোগমায়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পুত্রের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এতক্ষণ কেন বস্‌লি বাবা ? সন্ধ্যা উৎরে গেছে তো, এখন শো।" বলিয়া পুত্রকে একপ্রকার শোয়াইয়া দিয়া, তাহার ললাটের উপর আপনার দক্ষিণ হাতখানি রাখিলেন।

মায়ের সস্নেহ শীতল স্পর্শ অনুভব করিবা মাত্র শরতের দুটী চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। মায়ের কাছে তাহা আর লুকাইবার চেষ্টা না করিয়া, আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—"মা, ওকে আর এখানে আমার কাছে ডেকে এনে কষ্ট দিও না। আর কি হবে মা ?"

আকাশের বজ্র যদি মায়ের বক্ষে প্রবেশ করিত, তাহা হইলেও বুঝি তাঁহার ইহার অর্দ্ধেকও আঘাত বাজিত না !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ধুবিয়োগ

ভোরের বেলাতেই একটা আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইবামাত্র অশোক একটুও বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি শরৎদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্তরাত্রি যন্ত্রণাভোগ ও অনিদ্রায় শরতের মুখখানা অত্যন্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। সমস্ত শরীরটায় কে যেন নাড়া দিয়া দিয়া একেবারে অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। অশোক ঘরে ঢুকিতে শরৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাত দিয়া শুধু আসনখানা দেখাইয়া দিল।

'কেমন আছ?' প্রশ্নটা আজ যেন মুখে বাধিয়া গেল।

স্ত্রীর সঙ্গে সেই সাক্ষাতে শরৎকে যেন সেই দিনেই মরণের দিকে অনেকখানি পথ অগ্রসর করিয়াছিল। তার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে শরৎ এমন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখান হইতে মরণের দেশের তুষার-শীতল বাতাস মৃত্যুদূতেরই মত আহ্বান করিয়া লয়। ডাক্তারেরা তিন দিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, আর আশা তো নাই-ই, চেষ্টাও বৃথা। কবিরাজ কাল ভিজিট ও ঔষধের দাম শোধ করিয়া লইয়া বলিয়া গিয়াছেন,—আর সপ্তাহখানেক আগে হইলেও চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত; একেবারে নাভিশ্বাসের পর ডাকিলে আর আয়ুর্ব্বেদ কি করিবে? ভাঙ্গা নৌকা ভরিয়া এক নৌকা জল উঠিলে তাহাকে কূলের কাছে তুলিতে পারে এমন মাঝি কয়জন আছে?

অশোক আসনে না বসিয়া শরতের বিছানার উপরে মাথার কাছটিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কি বেশী কষ্ট হচ্ছে শরৎ?"

শরৎ একটু যেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"আগের মত নয়। এবার কষ্ট শেষ হয়ে আসছে।"

অশোক বড় দুঃখে আজ চুপ করিয়া গেল। আর একটু পরে শরৎ বলিল, "দেখ অশোক, নতুন যায়গায় যাবার আগে যেমন একটু আনন্দ অথচ কেমন একটা বেদনা বোধ হয়, বুকের মধ্যটায় কি রকম করে—কা'ল থেকে তেমনি হচ্চে। আজ সকালে এদিকটায় সরে এসে শুয়ে শুয়ে জানালার গরাদে দুটো দুহাতে ধরে বাইরের বাতাস ও খোলা আকাশটার পানে তাকিয়ে কেবলি মনে হচ্ছিল—এই জীর্ণ লোহা দুটো ভেঙ্গে মুক্ত আকাশের পানে ছুটে চলে যাই। আমার ভিতরকার প্রাণটারও আজ ঠিক এই অবস্থা। এই শীর্ণ দেহের জীর্ণ হাড়ক'খানা ধরে সেও আজ ভাব্‌ছে—তার এই ২২ বছরের ঘরখানা ভেঙ্গে ফেলে সেও ঐ আকাশের শীতল মেঘটার পানে ছুটে যায়।"

অশোক এবার একটু অনুযোগের স্বরে বলিল,—"ওসব কথা এখন কেন শরৎ?"

শরৎ একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—"এখন যদি না বলি ভাই, আর তো সময় হবে না।"

তার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর কপটতা কেন ভাই? এখন যদি তোমার মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপাল সাহেব এসে বলেন—তুমি বাঁচবে ভয় নেই; তাহলেও আমি আর সে কথা বিশ্বাস করিনে।"

তার পর বাহিরের দিকটায় একদৃষ্টে চাহিয়া শরৎ যেন আপন মনেই অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"এ যে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি। আর কি কারো কথা শুনি? এ তো আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া নয়, যেন মনে হচ্চে রাতের প্রদীপজ্বালা ঘর থেকে বেরিয়ে ভোরের আলোভরা বাইরের দিকে চলেছি।"

অশোক ব্যাকুলভাবে শরতের শীর্ণ বামহস্তখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—"শরৎ, ওরকম করে বলিস্‌নে ভাই !"

অশোকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা কাতরতা ছিল যে, শরৎ চোখের সাম্‌নে যে দৃশ্যটা দেখিতেছিল বলিয়া অনুভব করিতেছিল, তাহা আর না বলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল।

দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা কহিল না।

শরৎ বলিল—"অশোক, একটা অনুরোধ যে তোমার কাছে আছে আমার। সেটা না বল্‌লেই যে নয় ভাই।"

অশোক শুধু বলিল—"কি কথা বল ভাই।"

শরৎ বলিল—"মায়ের তো কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। শ্বশুরের অর্থ-লোভের পরিণাম শেষে কি হবে জানিনে। মাকে আমার তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। মায়ের ভার তোমার। আমি গেলে মায়ের তুমি একটিমাত্র ছেলে এই মনে কোরো। আমার মা তো অর্থের কাঙ্গাল নন্। মা যে স্নেহের কাঙ্গাল !"

শরৎ এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক সযত্নে শরতের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি ভেবো না ভাই--খুড়িমাকে আমি আমার নিজের মার মত চিরদিন মনে করব। আমি আমার মাকে ছাড়ব তবু খুড়িমাকে ছাড়্‌ব না। তুমি এসব কিছু ভেবো না ভাই, শান্ত হও।"

অশোক অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দুপুর বেলা হইতে শরতের নাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্যও ঘটিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শরৎ মায়ের কোলে মাথাটা রাখিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"মা, আর তুমি আমার কাছ থেকে উঠো না। আমার পায়ে হাত দিয়ে বোসো মা।"

যোগমায়া পুত্রের কণ্ঠে ও বক্ষে পরম স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"না, বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে আর উঠ্‌ছিনে, তোকে ছেড়ে আর কোথায় যাব বাবা!"

মায়ের একখানি হাত আপনার জীর্ণ বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া শরৎ বলিল—"কিন্তু আমি যে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি মা!"

যোগমায়ার মনের ভিতরটা তোলপাড় হইয়া গেল। তবু বাহিরে তিনি স্থির থাকিয়া বলিলেন, "অধীর হোস্‌নে বাবা। তুই যেখানেই যাস্ তোকে ছেড়ে আমি কোন খানেই বেশী দিন তো থাক্‌ব না। এখন আমার কথা আর ভাবিস্‌নে—একটু ভগবানের নাম কর্।"

শরৎ মায়ের পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"না মা, তোমার ছেলে হয়ে অধীর হব না মা। তুমিই আমার ভগবান্, মা! কিন্তু তুমি বলছ তাই ভগবানের নামও নিচ্ছি।" বলিয়া শরৎ কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। শুধু ঠোঁট দুটি একটু একটু নড়িতে লাগিল।

একটু পরে আবার চক্ষু মেলিয়া শরৎ বলিল—"আচ্ছা মা, তোমার পেটে জন্মে আমি কিছুই ভাল কায করতে পারলাম না কেন? তোমার উপযুক্ত সন্তান তো হলাম না মা!"

যোগমায়া অতিকষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া প্রগাঢ় স্নেহে পুত্রের ললাটের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"কেন হবিনে বাবা? তোকে যে ভগবান্ আপনার কাছে ডেকে নিচ্ছেন। নইলে তুই যে তাঁর চেয়েও বড় হতিস্—তাঁর চেয়ে বড় তো আমি কাউকে স্বীকার করিনে। ওকি, কষ্ট হচ্ছে বাবা?"

শরৎ একটু সামলাইয়া বলিল—"বুকের ভিতরটা এক একবার কি রকম কর্‌ছে। সব কথা যেন কি রকম ভুলে যাচ্ছি।" বলিয়া শরৎ এবার চক্ষু মুদিল।

"তবে একটু চুপ করে থাক" বলিয়া যোগমায়া পুত্রের কপালটিতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

খানিক পরে চক্ষু খুলিয়া শরৎ বলিল—"দেখ মা তোমাকে সত্যিই বল্‌ছি, এ জন্মে তোমার কাছ থেকে তোমার ভালবাসা পেয়ে আমার আশা মেটেনি। আমি যেখানে যাব, শুধু বল্‌ব, ঠাকুর, আমি আর কিছু চাইনে, আমাকে শুধু আমার মায়ের গর্ভে আবার জন্মাবার অধিকার দিও। যতবার পৃথিবীতে আসি না কেন, তোমাকে যেন মা বল্‌তে পাই। মা, তুমিও ভগবানের কাছে এই চাইবে তো?"

চোখের পল্লব দুইটি ভিজিয়া উঠিতেই উদ্যত অশ্রু রোধ করিয়া যোগমায়া বলিলেন—"চাইব বৈ কি বাবা! তুই যে আমার অনেক তপস্যার ধন!" অশ্রু ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে যোগমায়া পুত্রের অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বকার দিনের মত আহারাদি করিয়া রাত্রি ৯টায় অশোক যখন শরৎদের বাড়ী আসিল, তখন শরৎ সব মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, এই মত তাহার শীর্ণ হাত দুখানা বিছানায় বার বার কি খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

অশোক ডাকিল—"শরৎ, ও শরৎ—আমি অশোক, চিন্‌তে পারছনা?"

শরৎ একবার অশোকের মুখের পানে চাহিল। চিনিতে পারার কোন ভাব তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। সেই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। কাহারও পানে না চাহিয়াই শরৎ একবার বলিল—"না মা, আর জন্মে তুমি আমার মা হয়োনা, আমার মেয়ে হয়ো। এ জন্মে তোমার স্নেহের ঋণ যে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠ্‌ল মা, তার একটুও যে শোধ দিতে পারলাম না। আস্‌ছে বার তুমি আমার মেয়ে হয়ো, আমি তোমার মত করে ভালবাস্‌ব।"

একবার বলিল—"মা, বৌকে কেন আমার এই হাড় ক'খানার সঙ্গে বেঁধে রাখলে মা ? বৌকে ছেড়ে দাও। যাবার সময় ওর বুকে টান পড়ছে, জোর লাগছে, বাঁধনটা খুলে দাও না মা বৌ ছাড়া পাক্।"

রাত্রিশেষের দিকে শেষ বারের মত শরতের একটু যেন জ্ঞান হইল। যোগমায়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ একটু ঠাকুরদের নাম শুনবি ?" শরৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল শুনিবে।

যোগমায়ার কথানুসারে অশোক অশ্রুর সহিত স্বর মিলাইয়া গাহিল :—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে-কৃষ্ণ হরে রাম।

অশোকের সুমিষ্ট-স্বরে গীত অশ্রুসিক্ত কথাগুলি সচন্দন পুষ্পের মত সেই কক্ষের মধ্যে বর্ষিত হইতে লাগিল। করযোড়ে ঐ একই মন্ত্র বারে বারে সে বলিতে লাগিল।

যোগমায়া জানু পাতিয়া পুত্রের শিয়রের কাছে বসিয়া মনে মনে ঐ এক মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শরৎ হাতদু'খানি বুকের উপর যুক্ত করিয়া নিমীলিত নেত্রে শুনিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ রক্তহীন শীতল ওষ্ঠ দুটী কয়েকবার নড়িয়া উঠিল।

একটু পরেই মুক্তি-লালায়িত সেই ক্ষুদ্র পাখীটি পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া বুঝি মুক্ত আকাশের পানে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল।

অশোক তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ার জানালা খুলিয়া দিতেই বাহিরের ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস ও আলোক আসিয়া ঘরের মধ্যকার দীপশিখাকে মুহূর্ত্তে ম্লান করিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

যোগমায়া এতক্ষণে পুত্রের প্রাণহীন দেহ দুইহাতে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পিতৃমাতৃহীনা

শরতের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণে অশোক আসিয়া ডাকিল—"খুড়িমা।"

"এস বাবা" বলিয়া যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখাকৃতির সেই স্নেহপূর্ণ কোমল ভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল একটী সকরুণ কৃশতা তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনের জ্যোতিঃ মাখিয়া তাঁহার সর্ব্বদেহ ঘিরিয়া রহিয়াছে।

অশোক সভক্তিতে যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া, বসিল। যোগমায়া বলিলেন—"এবার যে অনেকদিন আসনি বাবা। বোধ হয় দুমাসের উপর হবে।"

অশোক বলিল—"মেডিকেল কলেজে ছুটি খুব কম কি না। আর এবার দ্বিতীয় বর্ষে আরও কায বেড়ে গেছে।"

"আচ্ছা, বস বাবা। এখনি আসছি"—বলিয়া যোগমায়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এই বসিতে বলিয়া চলিয়া যাইবার অর্থ অশোক বেশ জানিত। একটু পরেই ক্ষিপ্রহস্তে জলখাবার লইয়া, অন্নপূর্ণার মত তিনি যে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাহার সম্মুখে বসিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে খাওয়াইবার সময়, অন্তরের কোনও গোপনকক্ষে লুক্কায়িত পুত্রবিরহে মাতৃহৃদয়ের যে গভীর বেদনা বাড়িয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতে গিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল।

এফ্-এ পাসের পর অশোকের ডাক্তারী পড়াই স্থির হইয়াছিল এবং মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী আরম্ভ হইতেই সে কলেজে উপস্থিত হইল। এই চিকিৎসা-বিদ্যাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অশোকের পিতা অতুলকৃষ্ণ বসুকে এত প্রবল সুপারিশের আয়োজন করিতে হইয়াছিল, যাহাতে পূর্ব্বকালে অভাবপক্ষে একটা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অনায়াসে মিলিয়া যাইত।

যত দিন কলিকাতা যাইতে হয় নাই তত দিন অশোক অনেকক্ষণ ধরিয়া যোগমায়ার কাছে পুত্রস্নেহের দাবী লইয়া বসিয়া থাকিত। একমাত্র পুত্র-রত্নে বঞ্চিত বিধবার শোক-বিহ্বল অশ্রুহীন পাষাণ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে বসিয়া অভিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মত অশোক মৃত পুত্রের চরিত্র-মাধুর্য্যের কথা, তাহার অনন্যসাধারণ মাতৃভক্তির বিষয় কহিয়া যোগমায়ার বক্ষের গভীর দুঃখের কঠিন পাষাণ গলাইয়া দিয়া অশ্রুর নদী বহাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিল। তার পর পনেরো দিন অন্তর যখন বাড়ী আসিয়াছে, তখনি যোগমায়ার নিকটে আসিয়া পুত্রের মত তাঁহার নিকট আবদার করিয়া তাঁহার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা কথঞ্চিৎ শান্ত করিত। তাঁহার যা কিছু অসুবিধা তাহা পুত্রের দৌরাত্ম্যে যোগমায়ার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া অবিলম্বে দূর করিয়াছে।

আজ তিনমাস পরে বাড়ী আসিয়া খানিকক্ষণ শরতের এই ঘরটিতে বসিয়া পরলোকগত বন্ধু ও পুত্রশোকাতুরা জীবন্মৃতা মাতার কথা অশোক ভাবিতেছে, এমন সময় যোগমায়া খাবার হাতে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি তেরো বছরের বালিকা আসিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

অশোক আবার খাইতে খাইতে যৌবন সুলভ লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে খুড়িমা ?"

যোগমায়া মেয়েটির ম্লান অথচ সুন্দর মুখখানির পানে চা
কহিলেন—"ও আমার ছোট বোনের মেয়ে। ওরও নেহাৎ অদৃষ্ট খারা
তাই আমার কাছে এসে পড়েছে। যাও তো মা, গোটাকতক পাণ সে
নিয়ে এস।"

. মেয়েটি চলিয়া যাইতে যোগমায়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"
অদৃষ্ট, এই সে দিন—এখনও এক বছর হয়নি—বাবাকে হারিয়ে মার স
মামার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলে। বাবা মারা যেতেও আমার বো
একে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সেখানেই পড়ে ছিল। একমাস এগার দিন হ'
সেও মারা গেছে। খবর পেয়ে আমি গিয়ে একে কোন রকমে শুদ্ধ করে
তুলে, সঙ্গে করে নিয়ে আসি। ওর তো আর কেউ নেই।"

অশোকের তরুণ হৃদয় এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার জন্য সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। মুখ দিয়া সুধু একটা 'আহা' বাহির হইল।

যোগমায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমিই এক অসহায়! ঈশ্বর কেন যে অসহায়ার উপর আর এক অসহায়ার ভা দিলেন তিনিই জানেন।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটির বাপ কিছু থে যান্‌নি বোধ হয়?"

যোগমায়া। রেখে গিয়েছিলেন সবই। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামীর সঙ্গে সবই গেল। কথায় যে বলে বিধবার টাকার পাখা হয় সে কথা ঠিক। বাবা যখন আমার ভগ্নীপতি মারা যাওয়ার খবর পেয়ে গেলেন, তখন তাঁরা দেনার এমন ফর্দ্দি বার করে দিলেন, যা শোধ করে আসবার সময় বিধবা মেয়ে আর বারোবছরের নাতনীটি ছাড়া বড় একটা কিছু আন্‌তে পার্‌লেন না।

অশোক। আপনার বাবা মারা যেতে তাঁরা আর কোন খোঁজখবর নেন নি?

যোগমায়া। মামারা খোঁজ নিয়ে তাঁদের জানিয়েছিলেন। তাঁদের আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইলে তাঁরা বলেছিলেন, বড় বৌয়ের ভার নিতে তো তাঁদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু তের বছরের মেয়ের ভার তাঁরা কি করে নেন? তবে বড়বৌয়ের বাবা কি রেখে গেছেন জান্‌তে পারলে এবং সে সব যদি ওঁদের হাতে দেওয়া হয় তাহলে এ বাড়ীঘর বিক্রী করে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। সে বিধবা হয়ে তাঁদের যে পরিচয় পেয়েছিল তা খুবই মনে ছিল, সে জন্য আর তাঁদের হাতে যেতে রাজী হল না।

এমন সময় মেয়েটি ডিবা করিয়া কয়েকটী পাণ লইয়া অশোকের কাছে রাখিয়া, মাসীমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

যোগমায়া মেয়েটির ছোট কপালের উপর যে চুলগুলি পড়িয়াছিল তাহা সস্নেহে সরাইয়া দিয়া অশোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"শেষ সময় বুঝে সে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল, আর অনুকেও বলে গিয়েছিল আমারই কাছে আসতে।"

তার পর একটু থামিয়া যোগমায়া বলিলেন—"তিনি যদি থাক্‌তেন তা হলে তো এ ভার বলেই মনে হ'তনা।—অন্ততঃ শরৎও যদি থাক্‌ত। আমার কাছে বাছা এমন সময়ে এল যে কোন সুখেই বাছাকে রাখ্‌তে পারব না।"

অশোকের চোখ দুটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একটু আবেগের সহিত বলিয়া ফেলিল—"না খুড়িমা, ও কথা বোলো না। তোমার কাছে থেকে কেউ যত্ন পাবে না বা কারও কষ্ট হবে এ কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করিনে! সত্যি বল্‌ছি খুড়িমা, আমি যদি এই বয়সেও মরুভূমির মাঝখানে অসহায় হয়ে তোমার কোলে ঠাঁই পাই, তাহলে আমার আর কোনও ভয় থাকে না। এর চেয়ে বড় আশ্রয় তোমার বোন্‌ঝি আর কোথাও পেত না আমার তো মনে হয়। খুড়িমা, শরৎ ত চলে যায়নি,

সে যেন এই আমাদের সবারই মাঝখানে মিশে গিয়েছে। তোমার ও অফুরন্ত স্নেহ তো একজনের নয়, ও যেন পৃথিবীর সবারই প্রাপ্য। পাছে একজন অধিকার করে বসে তাই ভগবান্ তোমার সন্তানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

বলিয়া অশোক কাঁদিয়া ফেলিয়া, পরম ভক্তিভরে যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

যোগমায়া পুত্রোপম অশোকের প্রশংসায় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"মাকে কোন্ ছেলে কম ভাবে বাবা?—কিন্তু কথায় কথায় তোমার যে খাওয়া হল না।"

খাওয়াতে যেটুকু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেটুকু সারিয়া লইয়া অশোক বলিল—"খুড়িমা, আমি তোমার কাছে এইটুকু চাই—শরতের অধিকারটুকু আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হোয়ো না।"

এই কথা কয়টা বলিতে শিশুর মত ভাবপ্রবণ যুবকের চক্ষে যে অশ্রু টিয়া উঠিল, তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিলেন—"শরৎ গিয়ে ধ্যন্ত তুই তো আমার শরতের জায়গা পেয়েছিস্ বাবা। তোর ভিতরই শরৎ সবচেয়ে বেশী করে বেঁচে আছে।"

বলিয়া যোগমায়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুমার্জ্জনা করিলেন। মেয়েটির চক্ষু দিয়া নে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু পড়িতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় বালিকার অশ্রুসজল ম্লান মুখ একটি মধুর স্বপ্নের অশোকের মনে হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়

রথের কয়েক দিন পূর্ব্বে পাড়ার অনেকেই সেবার পুরীধামে যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অনুপ্রভা শিবপ্রসাদের স্ত্রী রুক্মিণীর নিকট তাহা শুনিয়া বাড়ী আসিয়া কহিল, "মাসীমা, ওঁরা সকলে পুরী যাচ্ছেন। তুমিও যাও না কেন?"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা যাচ্ছেন মা? তুই কোথা থেকে শুন্‌লি?"

অনুপ্রভা বলিল—"এ পাড়ার গিন্নিবান্নি প্রায় সবাই যাবেন। খুড়িমার মাও যাবেন। খুড়িমার কাছেই সব শুন্‌লাম। তুমিও যাও না মাসীমা। গেলে একটু শান্তি পাবে।"

রুক্মিণীর মাতা রুক্মিণীর কাছেই অধিকাংশ সময়ে থাকিতেন। যোগমায়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—"না মা, আমি যাব না। জগন্নাথ যদি শান্তি দেন তো তাঁকে ঘরে বসে ডাকলেই দেবেন।"

অনুপ্রভা বলিল—"আর মাসীমা, তীর্থ-মাহাত্ম্য তো একটা আছে। জগন্নাথ গিয়ে যারা জগন্নাথ দর্শন করে আসে তারা কি বেশী শান্তি পায় না?"

যোগমায়া বলিলেন—"তা বোধ হয় পায়। কিন্তু যারা গরীব তারা কি করবে মা?"

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"খুড়িমা বল্‌ছিলেন, দিদি গেলে মনটায় একটু শান্তি পেতেন। তাই শুনে তাঁর মা বল্লেন ও কি করে যাবে? ওর বোন্‌ঝি তাহলে কোথায় থাকবে?"

শেষের কথা কয়টা বলিবার সময় অনুর চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল, এবং কি একটা কথা সে সামলাইয়া লইল, যোগমায়া বেশ বুঝিলেন।

অনুপ্রভার মুখপানে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোট বৌয়ের মা বুঝি আর কোন কথা বলেছিলেন, না মা?"

অনুপ্রভা মুখ নত করিয়া রহিল। যোগমায়া মেয়েটির কোন কথাটিতে আঘাত লাগিয়াছে তাহা মনে মনে বুঝিয়া স্নেহ-স্বরে কহিলেন—"তিনি তোর সম্বন্ধে যাই বলুন মা, তুই তার জন্যে কিছু ভাবিস্‌নে। তুই খুব জেনে রাখিস্ মা, তুই এসে আমার কাছে বোঝার মত হস্ নি। কি করে কাকে নিয়ে সময় কাটাব তাই ভাবতাম, তাই ভগবান তোকে কাছে আনিয়ে দিলেন!"

বলিয়া যোগমায়া নতমুখী অনুপ্রভার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

অনুপ্রভা মাসীমার আদরে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"না মাসীমা, আমি তা ভাবব না। কিন্তু তুমি কেন আমাকে অশোক দাদাদের ওখানে কি খুড়িমার কাছে দিন কতকের জন্যে রেখে পুরী ঘুরে এস না?"

যোগমায়া সস্নেহে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, দেখি মা কি হয়।"

রাত্রে ক্রোড়ের কাছটিতে শায়িত অনুপ্রভার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়ার মনে হইল, এই যে অভাগী মেয়েটি বাপ মা সব হারাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহারই জন্য আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া সংসার বাঁধিতে হইবে। না হইলে শরৎকে হারাইয়া তিনি আবার সংসারে মন দিবেন তাহা কখনও ভাবেন নাই।

অনুপ্রভা মাসীমার স্নেহস্পর্শে বিগলিত হইয়া মৃদু স্বরে একবার ডাকিল—"মাসীমা!"

"কেন মা! এখনও জেগে আছিস্?"

অনুপ্রভার বিশেষ কিছু উত্তর দিবার ছিল না। তাই আর কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

যোগমায়া একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"আচ্ছা অনু, আমি যদি যাই, আমার সঙ্গে গেলে তুই সুখী হস, না থাক্‌লে? ঠিক সত্যি করে বল্‌ তো মা।"

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে গেলেই মাসীমা বেশী সুখী হই নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহলে একেবারে দ্বিগুণ খরচ; সে জন্যে তোমার একা যাওয়াই ভাল।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগমায়া জগন্নাথধাম যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং দুই দিন পরে ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়া অনুপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পাড়ার অন্যান্য সকলের সহিত পুরী যাত্রা করিলেন।

পুরীধাম পৌঁছিয়া যোগমায়ার মনে হইল, তিনি যেন এক নূতন জগতে আসিয়াছেন। সুশীতল প্রলেপের মত সমুদ্রের মুক্ত বাতাস তাঁহার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়কে প্রচুর পরিমাণে শান্তি দান করিল। সেই কোটি কোটি নর-নারীর ভক্তিনিবেদিত মন্দির দুয়ারে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মন হইতে অনেকখানি শোক দুঃখ ঝরিয়া পড়িল। জগন্নাথ মূর্ত্তির চরণতলে প্রণাম করিতে তাঁহার দুটি চক্ষু ছাপাইয়া জলধারা ছুটিল। ভগবানের কাছে যোড়-করে প্রণত শিরে প্রার্থনা করিলেন—হে প্রভু! হে জগন্নাথ! শরতের আত্মার কল্যাণ কর। আমার স্বামীর আত্মার কল্যাণ কর। হে ঠাকুর! তোমার চরণে মতি রাখিয়া আমি যেন তাঁহাদের জন্য শোক না করি। আর যাহার ভার আমার উপরে তুমিই দিয়াছ তাহার একটা গতি করিয়া, তোমার চরণপ্রান্তে তাঁহাদের কাছে গিয়া যেন জুড়াইতে পাই!

সমুদ্রের মুক্ত বাতাস তাঁহার বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিল। সমুদ্রের সেই অবিশ্রান্ত গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার কাছে যেন স্বর্গ মর্ত্তকে মিলিত করিয়া

দিতেছিল। সেই বেলাভূমে বিচ্ছুরিত তরঙ্গজড়িত কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ফল, কত ফুল, কত নানা বর্ণের নানা আকারের তুচ্ছ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেখিয়া যোগমায়ার মনে হইল, এ সংসারে কোন কিছুই নষ্ট হয় না। এই পৃথিবীর ক্লিষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব নরনারীর যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে বা হারাইয়াছে, সব এক দিন মরণ-সমুদ্রের কূলে এমনি করিয়া তাহাদের তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে।

প্রত্যহ দেবমূর্ত্তি, মন্দির ও সমুদ্র দেখিয়া কোথা দিয়া যে যোগমায়াদের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তাহা যোগমায়া অনুভবই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহযাত্রিগণের মধ্যে এক দলের মত হইল আর দেরী করিয়া কায নাই, এবার ফেরা হউক। আর এক দলের মত হইল আরও দিন কয়েক থাকিয়া যাওয়া যাউক; আর কখনও এত খরচ পত্র করিয়া আসা হইবে কি না সন্দেহ। শেষে এক দল এক দিন পরে যাত্রা করা, এক দল আর এক সপ্তাহ পরে যাত্রা স্থির করিলেন। যোগমায়া শেষোক্ত দলের সঙ্গে ফিরিবেন ইহাই মনস্থ করিলেন। ঠিক সেই দিন অশোকের এক টেলি-গ্রাম আসিল—শীঘ্র ফিরিয়া আসুন। বিশেষ প্রয়োজন।

যোগমায়াকে অগত্যা প্রথমোক্ত দলের সহিত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ফিরিতে হইল। কি এমন প্রয়োজন যাহার জন্য অশোককে টেলিগ্রাম করিতে হইল? তবে কি অশোকেরই কোন অসুখ হইল, এবং সে তাহা গোপন করিয়া এই ভাবে সংবাদ পাঠাইল? "আর দিন কয়েক তোমার চরণ দর্শন হইতে কেন বঞ্চিত করিলে প্রভু?" বলিয়া দেবতাকে সজল চক্ষে শেষবার প্রণাম করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন।

অনেকখানি আশঙ্কা লইয়া যোগমায়া যখন দেশের ষ্টেশনে পৌছিলেন তখন ভোর হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে তিনি রুক্মিণীর মা ও অনুপ্রভাকে লইয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বাড়ীর সম্মুখে পৌছিলেন। রুক্মিণীর

মা গাড়ী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি কন্সা জামাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। যোগমায়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইলেন।

তিনি দেখিলেন, বাড়ীর দরজা একটা নূতন তালা দিয়া বন্ধ, আর একখণ্ড কাগজে খুব বড় করিয়া লেখা—এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে। বাবু হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সন্ধান করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার আত্মা মরে না এবং তাহার জীবিতকালের অনেকখানি মনের ভাব বাঁচিয়া থাকে এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যখন যোগমায়া কয়েক দিন তীর্থবাসের পর তাঁহার স্বামীপুত্রের গৃহ-দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সেখানে তাঁহার আর প্রবেশাধিকার নাই, সেই তাঁহার স্বামী ও পুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত গৃহের দ্বার তাঁহার নিকট চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন শরতের আত্মা পরলোকের সমস্ত সুখ শান্তি ফেলিয়া এই তাহার ইহলোকের গৃহের দুয়ারে আসিয়া কি করুণ নেত্রেই না মায়ের পানে চাহিয়া ছিল! তাহার ইহলোকের হৃদয় তখন তাহার ছিল না, নহিলে তাহার প্রত্যক্ষ দেবী জননীকে গৃহতাড়িতা দেখিয়া সে হৃদয়খানি ফাটিয়া যাইত এবং সেখানে রক্তের নদী বহিত।

দুয়ারে তালা ও বিজ্ঞাপন দেখিয়া যোগমায়া খানিকক্ষণ সেই দুয়ারের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম বিমূঢ় ভাবটুকু কাটিয়া যাইতেই অশোকের টেলিগ্রামের কারণ তিনি বুঝিলেন এবং ইহা যে শরতের শ্বশুরের কার্য্য ইহা বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। কাহাকেও তিনি কোন অভিসম্পাত দিলেন না। অদৃষ্টেরও নিন্দা করিলেন না। এক দিন যে তিনি বড় মুখ করিয়া অশোককে বলিয়াছিলেন—যদি শরতের বিয়োগ দুঃখ তাঁহাকে সহিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন দুঃখই নাই যাহা তিনি সহিতে পারিবেন না—আজ এই সময়ে শুধু সেই কথাটা এক-বার মনে করিয়া মনকে সতেজ করিয়া লইলেন। মনে মনে একটিবার

বলিলেন—শ্রীমন্দির হইতে সন্ত ফিরিয়া তিনি এই সামান্ত দুঃখটাকে যদি তুচ্ছ না করিতে পারেন তবে তাঁহার দেবদর্শন বৃথা হইয়াছে। তাহার পর অতি ক্লান্ত ও ভীতিবিহ্বল অনুপ্রভার হাত ধরিয়া যোগমায়া অশোকের সন্ধানে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে রুক্মিণী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সানুনয়ে বলিল—"দিদি, এস।"

নিজের বাড়ীতে ঢুকিতে না পারার একটা লজ্জা যোগমায়ার মুখে ফুটিয়া উঠিতেই তাহা দমন করিয়া তিনি সহজকণ্ঠে কহিলেন, "আগে আমার একটা আস্তানা ঠিক করে নিই, ছোট বৌ, তার পর তোমার কাছে আসব'খন।"

এমন অবস্থাতেও যোগমায়ার এই সহজ ভাব দেখিয়া রুক্মিণী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—"আজকের দিন আর তুমি দোষ নিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি।"—বলিয়া রুক্মিণী সত্যই নত হইয়া যোগমায়ার দুটি পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

রুক্মিণীকে উঠাইতে গিয়া তাহার মাথার উপর যোগমায়ার ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া যোগমায়া বলিলেন, "তোর মন তো আমি জানি ছোট বৌ। তোর কাছে যেতে আমার কোন লজ্জা নেই ভাই। আর এ দুর্য্যোগে ঠাকুরপোর আশ্রয়ই তো আমার একমাত্র আশ্রয়ই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুই ত সবই জানিস্।"

রুক্মিণী আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "তবু দিদি তুমি আজকের দিনটাও চল। তুমি যদি আমাকে এমন করে ফেলে এখান থেকে চলে যাও, আমার স্বামী পুত্র কারুর মঙ্গল হবে না, আমার সর্ব্বনাশ হবে।"

যোগমায়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রুক্মিণীর আগে আগে দেবরের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অনুও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গিনীর পিতা হেরম্ব বাবু যেদিন সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বৈবাহিকা যোগমায়া দেবী দিন পনেরো হইল পুরীধামে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, তাহার কয়েক দিন পরেই তিনি একটি কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

হেরম্ব বাবু লোকটীর এক সময়ে বিষয় ও বুদ্ধি দুইটী জিনিসই অধিক মাত্রায় ছিল। গোড়া হইতে সূতা ছিঁড়িয়া ঘুড়ি ও সূতা গিয়া হাতে যেমন শূন্য লাটাইটী রহিয়া যায়, তেমনি কালক্রমে হেরম্ব বাবুর বিষয়ের অধিকাংশ উবিয়া গিয়া বুদ্ধিটুকু পুরামাত্রায় রহিয়া গিয়াছিল।

জামাতা শরতের মৃত্যুর পর হইতে কি করিয়া জামাতার বাটীখানা আপনার অধিকারে আনিয়া ফেলিবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বড় বড় উকিলদের নিকট হইতে বেশ করিয়া জানিয়াছিলেন, বৈবাহিক যদুনাথ বাবুর উইল অনুসারে এবং হিন্দু আইন মতে ঐ বিষয়ের উপর তাঁহার কন্যার ষোল আনা অধিকার, যোগমায়ার তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। বাড়ী অধিকার করিতে হইলে যোগমায়াকে বাড়ী হইতে সরানো সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সেইটিই এখন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। উকীল আইনমতে পরামর্শ দিলেন, উচ্ছেদের মোকদ্দমা করুন, তাহা হইলে আপনার জয় নিশ্চয়, তখন শরতের মা উঠিয়া যাইতে পথ পাইবে না। কিন্তু এ পরামর্শ তাঁহার মনঃপূত হইল না। প্রথমতঃ তাহাতে খরচ বেশী, দ্বিতীয়তঃ তাহা অনেক সময়-সাপেক্ষ। চাই কি গৃহে যাহার ষোল আনা অধিকার ছিল, তাহার মাকে একেবারে বাহির হইয়া যাইতে বলিতে শেষটা হয় ত আইনেরও চক্ষুলজ্জা আসিয়া পড়িবে এবং হয় ত বা একখানি ঘর পর্য্যন্ত তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে।

তাঁহার এক কূটবুদ্ধি বন্ধু উকিল তখন কাণে কাণে একটা পরামর্শ দিলেন। এইবারের পরামর্শটি তাঁহার বেশ পছন্দসই হইল। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

সেই সুযোগ মিলিল যখন যোগমায়া পুরী গেলেন।

হেরম্ববাবুর এক সম্বন্ধী তাঁহার বাড়ীতে থাকিত। থাকিত যে 'স্বভাবের' জন্ত তাহা নহে, নিতান্ত অভাবে পড়িয়া। হেরম্ব বাবুর শ্বশুর মৃত্যুকালে হেরম্ব বাবুকেই তাঁহার বিষয়ের অছি নিযুক্ত করিয়া যান। তখন কেবলরামের বয়স দশ বৎসর। তাহার দুই বৎসর পরে কেবলরামের মায়ের মৃত্যু হইলে কেবলরাম এই ভগিনীপতির গৃহে আশ্রয়লাভ করে।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে; তাহার বয়স ২৫ বৎসর হইলেও এখনও সে জামাই বাবুর অধীনেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ হেরম্ব বাবু অতি সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, শ্বশুরের সমস্ত দেনা শোধ করিতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে কুলায় নাই, তাঁহার নিজেরও কিছু গচ্চা লাগিয়াছে। কাযেই বেচারা কেবলরামকে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়া ভগিনীপতির অন্ন ধ্বংসের অপবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কেবলরামের শিশুকালে কি একটা চোখের অসুখ হইয়াছিল, তাই হেরম্ব বাবু প্রিয় শ্যালকের পাছে আরও চোখ খারাপ হইয়া যায় এই ভয়ে তাহার লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেও ভগিনীপতির সুবিবেচনার ফলে চক্ষুরত্ন সুস্থ সবল রাখিয়া সরস্বতীর খোঁয়াড় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। শিশুকালে মাথায় কি একটা পীড়া হওয়ায় সে সুখ দুঃখ ও মান অপমানের প্রভেদ জ্ঞান হইতেও অনেকটা পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

যোগমায়ার পুরী যাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে মতলব স্থির করিয়

হেরম্ব বাবু রাত্রি একটার সময় কেবলরামকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেবল, একটা কায খুব সাবধানে করে আসতে হবে। সুনীর শ্বাশুড়ী মাগীটা বাড়ীতে নেই, এই ফাঁকে সুনীর বাড়ীটায় দখল নিয়ে আসতে হবে। পারবে তো?"

কেবলরাম দখল নেওয়া কথাটা সম্যক্ না বুঝিয়া কহিল, "কি করতে হবে?"

হেরম্ববাবু কহিলেন—"এ বুদ্ধিটাও তোমার আজও হল না? তোমার সঙ্গে স্বরূপ আর দারোয়ান যাবে। সমুখের দুয়ার ভিতর থেকে বন্ধ। পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে যেতে হবে। তার পর ঘরে আসবাব আর যে সব জিনিস দামী দামী পাবে নিয়ে আসবে। শরতের জিনিস পত্র সব আনবে। তার পর তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, ওরা সব ঘরে আমার দেওয়া তালা বন্ধ করে আসবে। তার পর দরজার খিল খুলে বাইরে আসবে, এসে দরজায় এই বড় ভাল তালাটা লাগাবে। বুঝেছ?"

কেবলরাম তাহার বৃহৎ চোখ দুটা ভগিনীপতির পানে রাখিয়া বলিল, "সুনুর শ্বাশুড়ী যে এখন বাড়ী নেই। তিনি বাড়ী এলে তার পর গেলে ভাল হয় না?"

শ্যালকের এই অদ্ভুত বিজ্ঞতায় তাঁহার আর সহিষ্ণুতা থাকিত হইল না। তিনি বিষম চটিয়া কহিলেন—"গাধারাম, এইটুকু বুদ্ধিও ঘটে নেই? সে মাগী এলে তোমাকে ডেকে বলবে এস যাদু আমার, আমার দুয়োর ভাঙ্গবে। বাড়ী সুনীর, ওখান থেকে আমি তাকে তাড়াতে চাই, বুঝলে ঢেঁকীরাম?"

এত সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেও কেবলরাম ওরফে ঢেঁকীরাম বা গাধারাম কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, জামাইবাবুর বাড়ী হইতে জামাই বাবুর মাকে কি করিয়া তাড়ান সম্ভব হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া

কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে জামাই বাবুর মা এসে থাকবেন কোথায় ?"

হেরম্ব বাবুর ইচ্ছা হইল, যেমন করিয়া তিনি শ্বশুরের বিষয় ভক্ষণ করিয়াছেন, তেমনি করিয়া এই শ্বশুর-বংশধরের মুণ্ডটি ভক্ষণ করিয়া শ্বশুরবংশ সমাপ্ত করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই সাধু সংকল্প আপাততঃ কার্য্যে পরিণত না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"তার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমায় যা বল্‌ছি, তাই কর।"

কেবলরাম তাহার এই অন্নদাতা ভগিনীপতির ক্রোধের ফলটুকু বেশ জানিত। এখনও কাণে হাত দিলে বাল্যকালের কাণের দুর্দ্দশার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। কাণের সঙ্গে মাথাটার ভগবানের হাতের বাঁধন খুব শক্ত বলিয়াই কেবল কাণ দুটা টিকিয়া আছে। সে সব কথা মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবলরাম স্বরূপ ও দ্বারবানের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

যোগমায়া পুরী যাইবার সময় দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়াছিলেন ও প্রাচীর-সংলগ্ন দুয়ার দিয়া দেবরের বাড়ী যাইয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেবল যখন অনুচরদের সহিত প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে নামিল, তখন কিসের একটা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে সভয়ে স্বরূপের হাত ধরিয়া বলিল, "স্বরূপ আমায় ছেড়ে দেও না, আমার ভয় করছে। তোমরাই ত সব পারবে।"

স্বরূপ লোকটা বীরপুরুষ। দুর্দ্দান্ত প্রভুর অকৃতজ্ঞ শ্যালকের এই কাপুরুষোচিত উক্তিতে জ্বলিয়া সে ঘৃণাভরে হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "যাও না, গিয়ে একবার বাবুর কাছে মজাটি দেখগে।"

ভৃত্য-নির্দ্দিষ্ট সেই 'মজাটা' কল্পনা করা কেবলের পক্ষে মোটেই কঠিন হইল না। সে জন্য সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহাদের সহিত অগ্রসর হইল।

চন্দ্রালোকিত অর্দ্ধরাত্রে নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ দিয়া গৃহের পানে অগ্রসর হইবার সময় সরল নির্ব্বোধ কেবলরামের মনে হইল, যেন সে দলবল লইয়া একটা নিদ্রিত মানুষের প্রাণ লইতে চলিয়াছে। একটা আতঙ্ক ও ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সে রাত্রে শিবপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী রুক্মিণী তখনও জাগিয়া ছিলেন। অত রাত্রে মানুষের পদশব্দ ও কথাবার্ত্তার শব্দ কাণে যাইতে রুক্মিণী স্বামীকে বলিল—"হ্যাঁগা, দিদির বাড়ী থেকে শব্দটা আস্‌ছে না?"

এ ব্যাপারটা যে ঘটিবে, তাহার আভাস শিবপ্রসাদ পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা জানিত। যে ভ্রাতার উপরে তাহার কোন দিন কোন বিশেষ অনুরাগ ছিল না, সেই ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর জন্য তাহার কোন মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা ছিল না। বরং সে অপর পক্ষের এই দোষটা একটু ঢাকিয়া লইবার ভরসাই দিয়াছিল।

রুক্মিণী আর একটু পরেই পুনরায় কহিল, "হ্যাঁগা ঠিক মানুষের পায়ের শব্দ।" আরও খানিক কাণ খাড়া রাখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ওই বুঝি তালা ভাঙ্গলো গো। ওই শোন দুয়োর খুলে ফেল্‌লে। ওগো ওঠো না। একেবারে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে। দিদি এসে কি বলবে গো! ওগো ওঠো একবার!"

শিবপ্রসাদ পাশ ফিরিয়া একটি প্রকাণ্ড পাশ বালিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমার এখন ঘুম আসছে। তোমার যদি অত দয়া হয় ত তুমিই যাও!"

"হ্যাঁগা আমার সাধ্যি থাকলে কি আমি চুপ করে থাকৃতাম? ওগো একটিবার উঠে চেঁচিয়ে বল—কেও? তাহলেই পালাবে। নইলে দিদি এসে বাড়ী ঢুকে কি বল্‌বে?"

এবার শিবপ্রসাদ স্ত্রীকে একটু ভরসা দিয়া কহিল, "সে ভাবনা নেই।

এবার এসে আর বাড়ী ঢুকতে পারবে না। এরা সব শরতের শ্বশুরের লোক। জিনিস পত্র নিয়ে যাবে, সদরে তালা বন্ধ করে যাবে। চাই কি ভাড়াটেও বসাতে পাবে।"

রুক্মিণী আর কিছু বলিল না। সেই অভিমাননী স্বামিপুত্রহীনা নারী যখন আসিয়া এই কাণ্ড দেখিবে তখন সে কি ভাবিবে এবং সেই শোক.ও অত্যাচারবিদীর্ণ বক্ষস্থলের কি মূক অভিসম্পাতে তাহার স্বামী পুত্রের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে ইহা ভাবিয়া রুক্মিণী বারবার শিহরিয়া উঠিল এবং অশ্রু মুছিয়া লুটাইয়া আপনার অঞ্চলের একাংশ সিক্ত করিয়া ফেলিল। আর তখন এই সৌভ্রাত্রের দেশে, জ্যেষ্ঠের বিধবা আসিয়া নিরাশ্রয় হইলে তাহার অবস্থাটা কি পরিমাণে উপভোগ্য হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার মুখভাব নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ততক্ষণ হেরম্ব বাবুর অনুচর দুইজন সমুখের দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যে মধ্যে দিয়া শরতের শয়ন ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ ঘরেই শরতের যাবতীয় দ্রব্যাদি থাকিত।

জামাই বাবুর বিছানা বাক্স ও কয়েকটি ভাল ভাল জিনিস যাহা আলমারীতে ছিল তাহা একটু সন্ধান করায় মিলিয়া গেল। তাহা লইয়া স্বরূপ ও দ্বারবান বাহিরে আসিয়া দেখিল কেবলরাম নাই। দুই একবার মৃদুস্বরে ডাকিল, কোন উত্তর আসিল না। কেবলরামকে তাহারা চিনিত। বুঝিল, ভয় পাইয়া সে পলাইয়াছে।

একটু ভয়ে ভয়ে সম্মুখের ঘরের দুয়ারে প্রভুর দেওয়া নূতন তালাটী লাগাইয়া, জিনিসপত্র লইয়া তাহারা ধীরে ধীরে একেবারে বাড়ীর বাহিরে আসিল। তাহাদেরও মনে হইল কি যেন একটা অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। দারোয়ানটা তাড়াতাড়ি শিকল তুলিয়া দিতে স্বরূপ তাহাতে একটা মজবুত

তালা লাগাইয়া দিল। পকেট হইতে একটা লেখা কাগজ ও কাগজে জড়ানো খানিকটা আঠা বাহির করিল এবং কাগজের বিপরীত পৃষ্ঠে খানিকটা আঠা লাগাইয়া দরজার মাঝামাঝি জায়গায় তাহা লাগাইয়া দিল।

তার পর জিনিসপত্র সব গুছাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ দিয়া তাহারা প্রভুর গৃহাভিমুখে চলিল।

ঠিক সেই সময়ে হেরম্ব বাবু বৈঠকখানা ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, রোয়াকের একধারে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া।

"কে ?" বলিতেই মূর্ত্তি মৃদুস্বরে ভয়জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমি।"

"আমি কে ? কেবলা ?"

"আজ্ঞে।"

"এখানে দাঁড়িয়ে যে ? এরা সব কোথায় ? কথা কচ্ছিসনে কেন ?"

"এরা সেখানে।"

"সেখানে ? তুই চলে এলি যে ?"

"আমার ভয় কর্‌ছিল। জামাইবাবু দেখতে পাচ্ছিলেন।"

বিস্ময়ে ও রোষে ঈষৎ একটু স্তব্ধ থাকিয়া হেরম্ব বাবু বলিলেন, "আচ্ছা ভিতরে আয়।"

অত্যন্ত ভয়ে নিরুপায় হইয়া কেবলরাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্রগম্ভীর স্বরে হেরম্ব বাবু বলিলেন, "বদমাইসি ছেড়েদে। ঠিক করে বল্ কেন পালিয়ে এলি ?"

কেবলরাম ভয়ে ভয়ে বলিল, "জামাই বাবু রাগ কচ্ছিলেন, আর জামাই বাবুর মা ফিরে এসে আমায়—"

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবিংশবর্ষীয় শ্যালকের গালে প্রৌঢ় ভগিনীপতির প্রকাণ্ড চড় পড়িল। ভগিনীপতি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "জামাই বাবু রাগ কচ্ছিলেন ? জামাই বাবু মরে গিয়েছে জানিস নে ?"

চড় খাইয়া কেবলরামের ভয় অনেকটা কমিয়া গেল। গালের জায়গাটায় একটীবার হাত বুলাইয়া কহিল, "মরামানুষে সব দেখতে পায়, মার কাছে আমি শুনেছি। আমার যেন মনে হল, জামাই বাবু ঘরটায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বল্‌ছিল।"

এই অদ্ভুত আজগুবি গল্প শুনিয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া হেরম্ব বাবু আর একবার শ্যালককে অন্নদানের শোধ তুলিবার জন্য হাত তুলিলেন—এমন সময় স্বরূপ ও বিষণ সিং বাহির হইতে ডাকিল—"বাবু!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অধিকাংশ স্থলে স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে ভগবানের একটি নিগ হস্তের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী সদাশিব ভোলানাথ গোছে হইলে স্ত্রী বেশ একটু গোছালো এবং একটু কড়া ধাতের হইয়া থাকে স্বামী একেবারে দক্ষ স্বভাবের হইলে স্ত্রী সেখানে শান্তশিষ্ট। স্বামী হাত দিয়া যেখানে জলবিন্দু গলিবার উপায় নাই, স্ত্রী সেখানে একেবা মুক্তহস্ত। ভগবান প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ বৈচিত্র্য দিয়া শৃঙ্খলার ব্যব করিয়া রাখিয়াছেন।

রুক্মিণী যে যোগমায়াকে অত অনুনয় বিনয় করিয়া ডাকিয়া আনিয় ছিল, রুক্মিণীর স্বামী শিবপ্রসাদ মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়া তাঁহার কথাবার শুনিয়া বলিল—"হ্যাঁ গা, বড় বৌকে না কি নেমন্তন্ন করে ডেকে আ হয়েছে ?"

রুক্মিণীর মুখ হইতে মুহূর্ত্তে সমস্ত রক্ত সরিয়া গিয়া আবার স্বাভাবি অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই ভয়ানক তীক্ষ্ণ ও হৃদয়হীন কথা কয়টি যা দিদির কাণে গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় ও লজ্জায় সে স্বামীকে নিষেধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। পরক্ষণে মনে পড়িল যে, যোগমায়া নীচে রান্নাঘরে আছেন। তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীকে বলিল, "হুঁা, দিদিকে এ বাড়ীতে এনেছি, তাতে কি হয়েছে ? দিদির এই অবস্থায় কোথায় তুমি দিদির সাহায্য করবে, তা নয় তোমার মুখে এই কথা ?"

শিবপ্রসাদ পুরুষ বলিয়া যথেষ্ট অভিমান রাখে। সে বুঝিল, স্ত্রীর গরম কথায় এখন নরম হইলে হারিয়া যাইতে হইবে। বরং এখন নিজেও

ঐরূপ গরম থাকিতে পারিলে একটা মাঝামাঝি রফা হইতে পারে। ত
সে তাহার কণ্ঠকে উচ্চে চড়াইয়া কহিল—"দেখ, ওসব হবে টবে ন
ওকে অন্যজায়গায় ভর করতে বল। তুমি না পার আমি খেয়ে উ
বলছি।"

স্বামীর মনুষ্যত্ব রুক্মিণীর অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি এতখানির জ
সে প্রস্তুত ছিল না। দুঃখে ক্রোধে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।
একটু সামলাইয়া বলিল—"দেখ, তুমি যদি দিদিকে এতটুকু একটা অ
মানের কথা বল, আমি দিব্যি করে বলছি, আমি তাহলে আত্মঘাতী হ
তোমার হাত থেকে জুড়োব।"

কাযেই শিবপ্রসাদকে তাহার সাধু সংকল্প আপাতত স্থগিত রাখি
হইল। রুক্মিণী খুবই কম কথা বলে; কিন্তু যেটা বলে সেটা প্রায়ই
কাযে পরিণত করে, তাহা শিবপ্রসাদ জানিত।

আর গ্রাস কয়েক ভাত নিঃশব্দে খাইয়া লইয়া শিবপ্রসাদ কহি
"তোমারই ভালোর জন্যে বলছিলাম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে
তাই ভয় হয়। হেরম্ব বাবু কি বলে বাড়ী চাবি বন্ধ করেছেন জান?"

রুক্মিণী জিজ্ঞাসুভাবে স্বামীর পানে চাহিল।

শিবপ্রসাদ বলিল, "তিনি বলেছেন ওঁর লজ্জা সরম নেই। শরৎে
বন্ধু বলে যারা আসে, তাদেরই উনি বাড়ীর ভেতর ডেকে কথাবার্ত্তা ক
যেন তাদেরই ঘরকন্না। এ অবস্থায় তাঁর মেয়ের এখানে থাকা অসম্ভ
কাযেই তাঁকে বাড়ী অধিকার করতে হল। এত বড় বাড়ী ত আর ছে
দিতে পারেন না। তার উপর মায়ের বদনাম ত আছেই। যেমন
তেমনি মেয়ে, কথাটা তো—"

শিবপ্রসাদের কথাটা আর শেষ করিতে হইল না। রুক্মিণী একেবা
দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ, নিজের বড়ভাইয়ের সতীলক্ষ্ম

বৌয়ের সম্বন্ধে এমন কথা মুখে এন না। একেবারে সর্ব্বনাশ হ
আঁটকুড়ো হবে। যিনি দিদিকে এই করে ভিটে ছাড়া করলেন, আব
এই অপবাদ দিচ্ছেন, তাঁর তো হবেই। তুমিও যদি এ কথা আর দ্বিতী
বার মুখ দিয়ে বার কর, তোমারও হবে। এ আমি ঠিক বলছি।"

এমন জোরের সহিত রুক্মিণী কথা কয়টি বলিয়াছিল যে, শিবপ্রসা
বাল্যকাল হইতেই অসদাচরণে অভ্যস্ত থাকিলেও ইহার উত্তরে কি
বলিবার সাহস পাইল না।

ঠিক এই সময়ে রুক্মিণীর মা পিছনের বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকি
বলিলেন, "আমিও বলি মা, অতটা ভাল নয়। ঘরে মুখ বন্ধ করে কি
হবে মা, বাইরে যে এই কথাই টি টি হয়ে গেছে। তা তোরা কেউ য
ও কথা মুখ ফুটে মাগীকে বলতে না পারিস, আমিই বলছি। যে ক
দিন তোদের এখানে আছি তোদের ভাল ত দেখতে হবে।"

মা যে লুকাইয়া লুকাইয়া এই সব কথাগুলি শুনিতেছিলেন, ইহাতে
ঘৃণা ও রোষে রুক্মিণীর পিত্ত অবধি জ্বলিয়া গেল।

"মা তোমার এমন গায়ে পড়ে ভাল করতে হবে না। দিদি তোমা
চেয়ে শত গুণে ভাল, তা মনে রেখ। যতক্ষণ দিদি আছেন, ততক্ষ
দিদিকে যদি একটি কোন কথা তোমরা কেউ বল, তা হলে রক্তগঙ্গ
হয়ে মরব।"

বলিয়া রুক্মিণী রোষে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া এক প্রকার ছুটিয়াই
নীচের দিকে চলিয়া গেল।

সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ মুছিয়া একটু শান্ত হইয়া রুক্মিণী যখন
রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তার ঠিক একটু আগেই অশোক আসিয়া
নতমুখে যোগমায়ার নিকট দাঁড়াইয়াছে। অশোক তখন কাঁদ কাঁদ স্বরে
বলিতেছিল, "শরৎ যা বলে গিয়েছিল খুড়িমা, তা যে এত শীঘ্র হবে, তা

আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আমিও খুড়িমা অম্নে ছাড়ব না। আমি থান
খবর দিচ্চি। ডেপুটি বাবুকে খবর দিয়েছি। হেরম্ব বাবুকে আ
একবার দেখে নেব। শরৎ নেই বলে তিনি আজ তোমার এমন অপম
কল্লেন।"

বলিতে বলিতে অশোক সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগমায়া পুত্রস্নেহে অশোককে শান্ত করিয়া বলিলেন—"তো
তখনও বলেছিলাম, এখনও বল্‌ছি অশোক, শরৎকে হারিয়ে আমি যে দুঃ
পেয়েছি, এ দুঃখ তার কাছে কিছু নয়। তাই এতে আমার কোন ব
হবে না। তুই মনে ক্ষোভ করিস্ নে বাবা।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ত্যাগ

সেইদিন অপরাহ্ণে অশোক, যোগমায়া ও অনুপ্রভাকে লইয়া আপনাদের বাড়ীর নিকটে একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে লইয়া গেল। অশোকের পিতা মাতা বলিয়াছিলেন এবং অশোকেরও ইচ্ছা ছিল যে, যোগমায়া আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাদের ওখানেই থাকেন। তার পর রীতিমত মকদ্দমা করিয়া কি ফল হয় দেখিয়া অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু যোগমায়ার মাতৃগর্ব্বে এমন একটা আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি সম্মত হইতে পারিলেন না। রুক্মিণী অবস্থা বুঝিয়া আর সেই দিনটা থাকিয়া যাইতে যোগমায়াকে বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু এই অক্ষমতার ক্ষোভ ও দুঃখে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা করে, সেই তাহার পরমাত্মীয়কেও তাহার নিজের বাড়ীতে একটা দিন রাখিবার ক্ষমতা বা অধিকার নাই, এটুকু আজ দ্বিপ্রহরে যখন নূতন করিয়া এতখানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তাহার মনে হইল তাহারও যেন এ সংসারে আর সত্যকার স্থান নাই।

যোগমায়া চলিয়া যাইবার সময়ে রুক্মিণী তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"দিদি, আমার মত পোড়াকপাল কারুরও যেন না হয়। যাই হোক না কেন, আমায় তুমি যেন মন থেকে ঠেলো না। এইটুকু আমায় দয়া কোরো তুমি।"

অশ্রুজলে রুক্মিণীর কথা হারাইয়া গেল। রুক্মিণীর চোখের জলে যোগমায়ার পায়ের উপরটা ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি সস্নেহে রুক্মিণীকে

উঠাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ছোট বৌ, তুই যে আমায় কত ভালবাসিস্, তা কি জানি না আমি? তোর মন যে আমার কাছে দর্পণের চেয়েও পরিষ্কার। আমি সর্ব্বদা মন খুলে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, তুই সাবিত্রী সমান হ। তুই কিছু ভাবিসনে ভাই, আমি যে আজ এমনি করে চলে যাচ্ছি, এতে তোর কোন অকল্যাণ হবে না।" বলিতে বলিতে তিনি সজল নেত্রে বাড়ীর বাহির হইলেন।

অশোক যোগমায়াকে সংবাদ দিবার আগে অনেক কাণ্ড করিয়াছিল। মায়ের পত্রে বাড়ী বন্ধ করা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সে প্রিন্সিপাল সাহেবকে অনেক বলিয়া কহিয়া ছুটি লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া স্বচক্ষে দেখিল যে শরতের বাড়ীর দুয়ার শরতের মায়ের নিকট রুদ্ধ করা হইয়াছে। তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় সে একবারে জ্ঞানহারা হইল। সে একেবারে পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাসায় খবর দিয়া আসিল এবং যোগমায়াকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল।

মা আসিয়া ছেলের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, আর সে এমন ছেলে যে মা বলিতে আত্মহারা হইত। ইহা মনে করিয়া অশোক সমস্ত দিন পরামর্শ প্রতিকারের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। দুই চারিজন উকিল তাহাকে ভরসা দিয়াছিল যে শরতের মা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে চাবি ভাঙ্গিবার অভিযোগ করিলেই হেরম্ব বাবু কাবু হইয়া পড়িবেন। আজ যখন যোগমায়া দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া ডেপুটীবাবুকে এই সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়াছিল।

যোগমায়াকে নূতন বাসায় আনিয়া, তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অশোক তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। হেরম্ব বাবুর নামে নালিশ করিতে হইবে। তাঁহাকে আদালতে শুধু এই কথা বলিতে হইবে যে, তিনি সমস্ত চাবি বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন এবং

আসিয়া দেখিতেছেন সে সব তালা নাই, তাহার স্থলে নূতন তালা। নালিশ করিতে হইবে তিন জনের নামে—হেরম্ব বাবু, বিষণ সিং দারোয়ান ও হেরম্ববাবুর সম্বন্ধী কেবলরাম।

সেইদিন যোগমায়া বাহিরে স্থির থাকিলেও তাঁহার অন্তরটা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। শরতের ম্লান মুখখানি যেন এই অতি ক্ষুদ্র নূতন বাড়ীটার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শরতের ক্ষুব্ধ আত্মা যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া ফিরিতেছিল—"কেন মা তখন সে কথা শুনিলে না?" যোগমায়ার অন্তরে এখন ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি অশোকের কথাগুলি শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অশোক বলিয়া চলিল, "সাক্ষীর অভাব হবে না খুড়ি মা। যারা সব জানে, এমন দুই একজন বেঁকে দাঁড়িয়েছে সত্য, তবু সব সত্য কথা বল্‌বে।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, আমি যদি বলি ওসব হাঙ্গামে আর কায নেই, তুই কি বড় দুঃখিত হোস্?"

অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না না খুড়িমা, তা কেন তুমি বল্‌তে যাবে? এতে তোমার ত লজ্জা নেই। যে ছোটলোকের মত লোভীর মত ব্যাভার করেছে তারই লজ্জা।"

যোগমায়া বলিলেন, "দেখ অশোক, আমি ভেবে দেখলাম এ বিবাদের মধ্যে আমি আর যাব না। এই দুখানা ঘরেই যে ক'টা দিন বাঁচব, খুব কেটে যাবে। মেয়েটার জন্য ভাবনা; তা তুই রয়েছিস। মনে দুঃখ করিসনে বাবা!"

অশোক অত্যন্ত বিস্ময়ে যোগমায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "বল কি খুড়িমা তুমি? সব ছেড়ে দেবে?"

যোগমায়া বলিলেন, "আটকে রাখবার উপায়ও ত নেই বাবা। তালা

ভাঙ্গার মামলায় না হয় ওর সাজা পেলে, আমিও আপাততঃ জিনিসপত্র ও বাড়ী পেলাম। তার পর জানিস্ তো বাবা, এসব কিছুতেই ত আমার আইন মত কোন অধিকার নেই। বাড়ী থেকে আমি উঠে যাই এই যখন ওঁদের ইচ্ছা, তখন কেন আমি আর বাধা দেব? আমি যদি থাক্‌বার স্বত্ব চাই, তখন ত মামলা কত্তে হবে বৌমার সঙ্গে—আমার শরতের বৌয়ের সঙ্গে!"

এইখানটায় যোগমায়ার গলাটা ধরিয়া আসিল।

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তাতে আর কায নেই বাবা! যা নালিশ লিখিয়ে এসেছ, উঠিয়ে নিয়ে এস। যাদের অধিকার তারাই নিক্ বাবা! আমার যা কিছু ছিল সব ত শরতের,—কাযেই সবই বৌমার। সে বড় অভাগী। এ নিয়ে যদি একটু ভুলে থাকে, থাক্।"

অত্যন্ত আহত হইয়া অশোক বলিল, "আর তুমি মা হয়ে কি ভেসে যাবে খুড়িমা?"

যোগমায়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমায় যে ভগবান ভাসিয়েছেন বাবা! মানুষে তার কি করবে? আমিও তো অনেক পেয়েছি। শরতের কাছে আমি যা পেয়েছি, সে যে আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে। বাড়ী ঘর তার তুলনায় তো কিছুই নয় বাবা!"

অশোক একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"কিন্তু খুড়িমা, এমন করে শেষটা অত্যাচারীর কাছে হেরে যেতে হবে? তোমার বাড়ীঘর খুড়িমা, ওরা সুযোগ পেয়ে এমনি করে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নেবে, আমরা তার কোন প্রতিকার করবো না?"

বলিতে বলিতে অশোক কাঁদিয়া ফেলিল।

"কেন অশোক দুঃখ করছিস্ বাবা? তুই কি আমাদের ভার নিতে পারবিনে? তোর কাছে কিছু নিতে ত আমার লজ্জা নেই বাবা! মনে

কর্ ওদের জিনিস ওদের কাছে দিয়ে আমি তোর কাছে এসে আশ্রয় নিলাম। শ্বাশুড়ী বৌয়ে মাম্‌লা সেটা কি ভাল ? তার চেয়ে আর এক ছেলের কাছে আশ্রয় নেওয়া কি ভাল নয় ?" বলিয়া যোগমায়া এমন পুত্রস্নেহের দাবীতে অশোকের পানে চাহিলেন যে, অশোক মনের ক্ষোভ অনেকটা ভুলিয়া বলিল, "তা হলে খুড়িমা আজ থেকে তোমাদের ভার আমার। কিন্তু তুমি যে কিছু বল না খুড়িমা।"

যোগমায়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আজ থেকে বলব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মামলার তদ্বির

যোগমায়া পুরী হইতে ফিরিয়াছেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র, হেরম্ব বাবুর দল কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। যোগমায়া আসিবার পর দিনই অপরাহ্ণে হেরম্ব বাবুর বৈঠকখানায় তাঁহার হিতৈষিগণের একটা সভা বসিল।

এক বন্ধু বলিলেন, "ওহে, এ খবরটা পাকা যে ডেপুটি একবার গোপনে তদন্ত করবেন। তা হলে আমাদের তদ্বিরটা একটু ভাল করে করতে হবে।"

একজন পাকা উকিলের মুহুরী সেখানে ছিল। সে এই সুযোগে একটু আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল, "তার জন্য কিছু ভাববেন না শ্যাম বাবু, সে সব শিখিয়ে পড়িয়ে আমি ঠিক করে নেব। মামলা এমন সাজিয়ে দেব যে, বাড়ী অনেক দিন থেকে আপনাদের দখলী সম্পত্তি, তা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

হেরম্ব বাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "যা করবার, তা হলে এখনি করে ফেল বাঁড়ুয্যে। শেষটা আবার বলে বস না যেন, দুদিন আগে যদি বলতেন, তাহলে কি এমন মামলা ফসকায়। তোমাদের আবার সে গুণটি বিলক্ষণ আছে।"

লোকটি সত্যকারই পাকা মুহুরী বলিয়া, এই খোঁচাতে কিছুমাত্র না দমিয়া, অন্ততঃ বাহিরে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছোট বাবু, আপনার যদি জিৎ না হয়, আমি

মুহুরীগিরি ছেড়ে দেব। এ ত আপনার ন্যায্য অধিকার। কত বলে রামের জিনিস শ্যামকে দখল দিয়ে দিলাম। এই সেদিনও ত হরিশ রায়কে এক কথায় তার মামীর বাড়ীতে বসিয়ে দিলাম। মাগী এখন কাশীতে গিয়ে কোন ছত্তরে বুঝি রাঁধে আর খায়। মাগী কি কম জাঁহাবাজ, বাপরে বাপ! যাবার আগে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে বল্লে কি না, আমায় যেমন তুমি পাকেচক্রে আমার স্বামীর ভিটে থেকে তাড়ালে, তোমার পরিবারকেও একদিন যেন ছেলে মেয়ের হাত ধরে এমনি করে বেরুতে হয়। মাগীকে এক ধাক্কা দিয়ে বাড়ী পার করে দরজা বন্ধ করি, তবে থামে।"

ঘরের শেষ প্রান্তে একজন নূতন লোক কোন ফাঁকে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "মাগীর বড় অপরাধ বাঁড়ুয্যে মশায়! তাকে আপনি ভিটে ছাড়া কল্লেন, সে কি এসে আপনার স্তবস্তুতি করবে বল্‌তে চান?"

বাঁড়ুয্যে লোকটি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি বড় বাবু যে! কবে এলেন? দেশের দিকে যে ফিরেও চান না। কেবল তীর্থ ধর্ম্ম নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন?"

বলিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার পানে তাকাইল। হরিশ রায় ও তাহার ভগিনীর কথা যে কখনও উঠিয়াছিল, এমন ভাবও তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

পূর্ব্বোক্ত লোকটি কহিলেন, "কাল সবে এসেছি, এসেই তোমাদের সব সাধু কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনছি।"

তার পর হেরম্ব বাবুর পানে চাহিয়া কহিলেন, "যেরকম সব করে তুলছ মণি, এতে আর তোমাদের এদিকে ফিরবার ইচ্ছে নেই। এইবার শেষ।"

যিনি কথা বলিলেন, ইনি হেরম্ব বাবুর জ্যেষ্ঠ ভাই, নাম ভৈরবচন্দ্র। ইনি এককালে খুবই সৌখীন ও বাবু ছিলেন। তখন অবস্থাও খুব ভাল ছিল। হঠাৎ স্ত্রীবিয়োগ হইলে একেবারে বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসী গোছ হইয়া পড়িয়াছেন। হেরম্ব বাবুকে নিজের বিষয়ের অংশের যাহা কিছু আয় সমস্তই ছাড়িয়া দিয়া, বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে কাটাইয়া থাকেন। বৎসরে কেবল একবার দেশে ফিরেন; ২।১ দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যান।

দাদার কথা শুনিয়া হেরম্ব বাবু বলিলেন, "আসতে না আসতে আপনি কি এমন শুনলেন যার জন্যে অমন বলছেন?"

তাঁহার দাদা বলিলেন, "শরৎ বাবাজীর মাকে তুলে দিয়ে তুমি যে ভাড়াটে বসাবার সংকল্প করেছ, বা নিজেই মেয়ের হয়ে দখল করবে ভেবেছ, সেটিকে ত আমি কিছুতেই ভাল বলতে পারিনে মণি।"

হেরম্ব বাবু যুক্তি মনের মধ্যে যেন বেশ করিয়া একটু শানাইয়া লইয়া বলিলেন—"আপনিও যে একেবারে পরোপকারী লোকদের মত কথা বলছেন। ভেবে দেখুন, ওটা আমার বিধবা মেয়ের সম্পত্তি, কারও উপর দয়া করে ওটা ছেড়ে দেবার অধিকার আমার নেই। আর আমি বেঁচে থাকতে ওর বাড়ীর ব্যবস্থাটা করে না গেলে, আমার অবর্ত্তমানে কি ওরা একে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেবে ভেবেছেন? কথনো নয়। তার উপর সম্পত্তির অবস্থাও জানেন; তার জন্যে আলাদা করে কোন ব্যবস্থা করে যাব, সে ক্ষমতাও নেই। ছেলেটা এখনি যে রকম হয়ে উঠছে, ও যে বড় হয়ে কাউকে দুমুঠো ভাত দেবে তার ভরসাও খুব কম। এ অবস্থায় আমাকে কি করতে বলেন?"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "শরতের মাকে জীবনস্বত্বে দুখানা ঘর দিয়ে বাকীগুলো দখল করলেই পারতে। ঘরের ত অভাব ছিল না।"

হেরম্ব। তা হলে ত সে দুখানা ঘর থেকে আমার মেয়েকে বঞ্চিত করতে হ'ত। যখন সব শুনেছেন তখন ওদের কথাও ত শুনেছেন! আইনতঃ ওঁর তো কোন অধিকার নেই। এ অবস্থায় আমার অধর্ম্ম করা কোনখানটায় হল? হিন্দু-আইন হিসেবেই ওঁর এতে কোন অধিকার নেই।"

ভৈরব। আইন পালন করাটাই সব সময়ে ধর্ম্ম পালন করা নয় মণি। তোমার বাড়ী থেকে যদি কোনও লোক ক্ষিদের জ্বালায় দুমুটো চাল চুরী করে, আর তার জন্যে যদি তাকে তুমি পুলিশে দাও, তাহলে তোমার আইনমতে কায করা হবে, কিন্তু ধর্ম্ম মতে নয়।"

উপরের কথাগুলি এমনি জোরের সহিত ভৈরব বাবু বলিলেন যে, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার মনে অত্যধিক জাগরূক থাকিলেও হেরম্ববাবু বলিলেন, "আমি কি শরতের মাকে একেবারে বাড়ী থেকে চিরকালের মত তাড়িয়ে দিতে বলছি? বাড়ীটা একবার আগে দখল নিই, তার পর তাঁকে ডেকে এনে নীচের একটা ঘর ছেড়ে দেব। বিধবা—তাঁর একটা ঘরই যথেষ্ট। আমার কাছে একবার আসতে তাঁর অপমান হল। তিনি গেলেন আমার নামে নালিস করতে! আমিও অল্পে ছাড়ছি না।"

তার পর সেই পরিপক্ক উকিলের মুহুরির পানে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ, বাড়ুয্যে, বিষণ সিং টিংদের একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করে [illegible] দিকি। আবার তারা যা তা না বলে বসে।"

ভৈরব বাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুহুরি মহাশয়ের আদেশে স্বরূপ ও কেবলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বরূপের প্রতি মুহুরীর প্রশ্ন হইল—"তুমি কদিন হল এখানে ফিরেছ?"

স্বরূপ। সবে পরশু ফিরেছি।

মুহুরী। এর আগে কোথায় ছিলে ?

স্বরূপ। বাবুর এক চিঠি নিয়ে ঘোড়ামারায়।

মুহুরী। সেখানে কত দিন ছিলে ?

স্বরূপ। দশ বার দিন।

মুহুরী। ৩রা চৈত্র বুধবার কোথায় ছিলে মনে আছে ?

স্বরূপ। সেই ঘোড়ামারাতেই।

মুহুরী। কি করে তোমার মনে থাকল যে ৩রা চৈত্র তুমি সেখানে ?

বি। আজ্ঞে আজ ১০ই চৈত্র বুধবার। আমি এসেছি পরশু ৮ই। সেখানে ছিলাম ১০।১২ দিন। কাযেই সেখানেই ছিলাম।

তার পর বিষণ সিংকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার বার বা তারিখ ঠিক মনে নাই! তবে সপ্তাহ দুই হইতে তাহার মরিবার সময় ছিল না,—জামাই বাবুর বাড়ী যাওয়া ত দূরের কথা। সকালে উঠিয়া বাবুর আদেশে সে এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া রান্না বান্না করিয়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ শয়ন করিয়াছে।

তার পর আসিল কেবলরামের পালা। সে বেচারা তাহার সেই সেদিনকার অসৎকর্ম্মের সঙ্গীদের কথাবার্ত্তায় স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার সেই নিরীহ চোখ দুটা যেন বড় করিয়া চাহিয়া তাহাদের বলিতে চাহিতেছিল, "অঁ্যা! বল কি বিষণ, বল কি স্বরূপ? সে রাত্রের কথা কিছুই জান না?"

কেবলরাম যে বাবুর সম্বন্ধী তাহা মুহুরী জানিত বলিয়া সে কেবলরামকে একটু আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এবার তোমার কথা বলত ভাই।"

কেবলরাম তাহার গরুর মত শান্ত চোখ দুটা মেলিয়া মুহুরির পানে একবার চাহিল। ভাবটা—কি কথা বলিবে?

মুহুরী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন ৬।৭ আগে তুমি এক দিন তোমার ভাগ্নীর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলে ?"

কেবলরাম মৃদুস্বরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

হেরম্ব বাবু তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিলেন।

মুহুরী বলিল, "বাঃ, দিন আষ্টেক থেকে তোমার খুব পেটের অসুখ হয়েছিল তখন বল্লে, আর এখনই ভুলে গেলে !"

কেবলরাম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, "আপনি বল্লেন তা মনে আছে। তবে আমার ত পেটের অসুখ হয় না।"

"বাঃ, শ্রীবিলাস কবরেজের ডালিম পাতার রস দিয়ে ওষুধ খেলে ক'দিন সে বুঝি শুধু শুধু ?"

বেচারা অবাক হইয়া রহিল। কবে বা তাহার পেটের অসুখ হইল, এবং কবে বা কি করিয়া তাহা সারিল, ইহা ভাবিয়া সে কিছুই কূল কিনারা পাইল না।

মুহুরী তখন অন্য রকমে চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, *"আচ্ছা, আজ কি বার বল ত ?"*

কেবলরাম এতক্ষণ পরে একটা জবাব দিবার মত প্রশ্ন পাইয়া সোৎসাহে বলিল, "বলব ? আজ বুধবার।"

মুহুরী। আচ্ছা, আজ বুধবার, এর আগের বুধবারে রাত্রে তুমি কোথাও গিয়েছিলে ?

কেবলরাম একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈকি। জামাই বাবুর বাড়ী। ছোট দাদাই ত আমাকে—"

কিন্তু কেবলরামের আর অগ্রসর হওয়া হইল না। হেরম্ব বাবু অত্যন্ত উগ্রস্বরে স্বল্প কথায় বলিলেন "গাধা !"

কেবলরাম তাহার জামাই বাবুর বাড়ী যাওয়ার সহিত ঐ ভারবাহী

পশুর কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময় ও ভীতিবিহ্বল মুখে তাহার অন্নহারক ও আশ্রয়দাতা ভগিনীপতির পানে চাহিয়া রহিল।

হেরম্ব বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল, কেবলরামের কর্ণ দুটি ধরিয়া, কি তাহাকে বলিতে হইবে, তাহা ঠিক সাধারণ রকমে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠের সন্নিধিতে সেই হিতকারক কার্য্যটা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবু তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া কহিলেন—"বেশী জেঠামো করিসনে কেবলা। তুই কোনওদিন কোনওকালে কোনও রাত্তিরে শরৎদের বাড়ী যাস্‌নি। আমি তোকে কোথায়ও কখনও পাঠাইনি।"

তথাপি সেই নির্ব্বোধ শিশুর মত সরল যুবক বলিল, "সেই যে আপনি আমাকে যেতে বল্লেন ছোট দাদা!" বলিয়া সেই দাদার ক্রুদ্ধ ও ভীষণ মুখভাবের পানে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন কেহ তাহাকে বলিল বোকারাম, কেহ বলিল অকালকুষ্মাণ্ড, কেহবা বলিল, বাবুর ঘরে এমন গাধাও জন্মায়। এমন কি যে মুহুরীটি একটু আগে তাহাকে বাবুর শ্যালক বলিয়া একটু সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিল, সেও বলিয়া ফেলিল, "এ সাদা কথাটিও বুঝতে পার না—ভগবান্ বুঝি ঘটে বুদ্ধি জিনিসটা একেবারেই তোমায় দিতে ভুলে গিয়েছেন!"

সকলে যখন কেবলরামের উপর এই বিদ্রূপ ও অপমান বর্ষণ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় ভৈরব বাবু উঠিয়া কেবলরামের কাছে গিয়া তাহাকে কাছে আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কেবল, তুমি দুঃখ কোর না ভাই। ভগবান্ বুদ্ধি তোমায় একটু কম দিয়েছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে বেশী ভাল, সত্যের মর্য্যাদাটা এখানকার অনেকের চেয়ে বেশী দিয়েছেন। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ভাই? কত দেশে বেড়াব তোমাকে নিয়ে।"

কেবলরাম তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া বলিল—"হাঁ বড়দা, যাব। কবে আপনি যাবেন?"

ভৈরব বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যেদিন যাব, তোমাকে নিয়ে যাব।"

পরে হেরম্ব বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "মণি, তোমার এই বোব সম্বন্ধীকে আমাকে দেও। এর কাছে তোমার ত আর কো প্রত্যাশ নেই।"

কথার ভিতর যে খোঁচাটুকু ছিল, তাহা যথাস্থানে পৌঁছিল। কিন্তু যে দাদার বিষয়ের অংশের আয় হইতে যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহার উপর ক্রোধ বা আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন—"তা নিয়ে যাবেন—আমিও বাঁচি।"

এই কথা শুনিয়া কেবলরাম সমস্ত মন দিয়া যেন মুক্তিলাভ করিল। সে ভৈরব বাবুর দিকে আর একটু সরিয়া বসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"

যে ঘরে হেরম্ব বাবুরা বসিয়া এই সব আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার পাশেই একটা ঘরে ভৈরব বাবুর জন্ম একখানি চৌকির উপর কম্বল বিছান ছিল। যখন তিনি আসেন ঐ ঘরটাই অধিকার করেন। বাড়ীর মধ্যে বড় একটা যানই না।

কেবলরামকে ছাড়িয়া দিতে ভ্রাতার কোন আপত্তি নাই শুনিয়া তিনি তাঁহার ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেবলরামও আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল।

হেরম্ব বাবুর ঘরে তখন পুরাদামে জবানবন্দী ও জেরার রিহার্সাল চলিতে লাগিল। কিন্তু কেবলরামকে লইয়া কি করা যাইবে, সেই সম্বন্ধে মস্ত একটা খটকা রহিয়া গেল।

এই সব ব্যাপার লইয়া যখন সকলেই ব্যস্ত, এমন সময় একটি লোক আসিয়া হেরম্ব বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি পড়িয়াই হেরম্ব বাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলকে শুনাইয়া তিনি বলিলেন, "ওহে, হরেন বাবু লিখছেন—একটা সুসংবাদ। মোকদ্দমার জন্ম আর ভাবতে হবে না। বেয়ান কেস্ উঠিয়ে নিয়েছেন—তিনি মামলা চালাবেন না।"

শ্যামবাবু নামক বন্ধু বলিলেন, "মাগী বোধ হয় শেষটা ভয় পেয়ে গেল।" কথাটা হেরম্ববাবুর মনঃপূত হইল।

তার পর শেষে "বেশ হল, খাসা হল," ইত্যাদি অভিনন্দনে হেরম্ব বাবুকে আপ্যায়িত করিয়া একে একে সকলে উঠিয়া পড়িলেন। সবাই চলিয়া গেলে ভৈরব বাবু ডাকিলেন, "মণি, শুনে যাও।"

হেরম্ব বাবু ভ্রাতার নিকটে আসিলেন। কেবলরাম তখন বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল।

ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করবে ভাবছ মণি?

হেরম্ব বাবু বলিলেন, "যদি শরতের মা এসে বলেন থাকার জায়গা দিন, তবে দেব, নইলে দেব না।"

ভৈরব বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ মণি, যদি আমার কথা শোন, তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে ঐ বাড়ীতে বসাও। সুনুকেও সেখানে পাঠিয়ে দেও। তাহলে তোমার মুখও থাকবে, ধর্ম্মের কাছেও অপরাধী হতে হবে না।"

হেরম্ব। আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি, মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমি তা করতে পারিনে। আর উনি ভেবে চিন্তে সুবিধে না দেখে কেস্ তুলে নিলেন বলে আমাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে?

ভৈরব। মণি, কখনো ভেবনা যে তিনি ভয়ে বা আশঙ্কায় মোকদ্দমা তুলে নিচ্ছেন। তিনি মোকদ্দমা চালালে তোমাকে বিপদে পড়তে হত। তোমার নিজের বাড়ীতে যদি কেউ বাস করে, তারও অনুমানে তুমি তাকে বাড়ী চড়াও করে জিনিস আনতে পার না। কিন্তু তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্যে যে তাঁর মাতৃগর্ব্বে আঘাত লেগেছে। যাঁর মনে মনে একটু বেশী আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, তাঁর পক্ষে লোকের কাছে বলা বড় শক্ত যে আমি মা, আমার বাড়ী থেকে তাড়াতে পার না।

হেরম্ব। তা হলে কি আপনি বলতে চান যে, তিনি মামলা তুলে নিলেন বলে, আমাকে তাঁর খোসামোদ করতে হবে?

ভৈরব। তুমি যদি তাঁকে বাড়ীতে ফিরে আসতে না বল, তা হলে তোমার একটা মহা অনিষ্ট হবে, এ আমি তোমাকে বলছি।

হেরম্ব। এ কথা আপনার বলবার কি হেতু?

ভৈরব। তোমাকে একটা কথা বলি শোন। আমি অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কাছে শুনেছি, আর নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি যে, একজন যদি আর একজনের উপর বিনা দোষে অত্যাচার করে, আর সেই নির্দ্দোষ লোক যদি কোন অভিসম্পাত না দিয়ে কোন দুর্ব্বাক্য না বলে শুধু ভগবান্‌কে সে কথা জানায়, তাহলে যে অত্যাচার করে তার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। নিজে হাতে দণ্ডের ভার না নিয়ে ভগবানের হাতে দণ্ডের ভার দিলে দণ্ডের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে থাকে।

হেরম্ব। এখানে বিনাদোষে অত্যাচার হচ্চে?

ভৈরব। অত্যাচার আর কাকে বলে মণি? অদৃষ্টদোষে বিধবা হল। তার পর ছেলে মারা গেল—তবু সেখানকার মায়া কাটাতে পারলে না। আর তুমি আইনের ওজর দেখিয়ে তার অনুপস্থিতে সেই বাড়ী অধিকার করে বসলে। আইন যাই কেন বলুক না, ভগবান আর মানুষের হৃদয় কিছুতেই মানবে না যে মায়ের কোন অধিকারই নেই, বৌয়েরই অধিকার।

হেরম্ব ঠিক মত উত্তর দিতে না পারিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার বিষয়ের আয়টা ক'বছর থেকে নিচ্চি কি না, তাই আপনি অত করে দুর্ব্বাক্য বল্লেন।"

ভৈরব বাবু হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পর ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "এত দিন পরে তুমি যদি এই কথাটাই ঠিক করে থাক যে আমার বিষয়ের আয়টা তুমি ভোগ করছ বলেই আমি তোমাকে এসব কথা বলচি, তা হলে আমার আর বলবার কিছু নেই। বিষয়ের আয় ত তুমি জোর করে বা ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছ না যে, আমার সে জন্ত কোন রকম অসন্তোষ হবে।

আমার ইচ্ছে ছিল সে সম্পত্তিটা তোমার নামে না দিয়ে সুধীরের নামে দেব, সে জন্ত এত দিন দানপত্র করে দিইনি। এবার সব শেষ করে যাব। কিন্তু এখনও আমার অনুরোধ শোন মণি। তাঁকে সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে আন। মেয়েটীকে দুচারবার সেখানে পাঠাও। ক্রমশ আপনি আপনি দখল হয়ে যাবে। নইলে সত্য বলছি মণি, তোমার জন্তে নয়, আমার বেশী ভয় হয় সুধীরের জন্তে। আমি এরকম ঘটনা ২।৪ টা দেখেছি।

শেষের কথা কয়টি ভৈরব বাবু মৃদুস্বরে যেন আপনা আপনি কহিলেন।

"কিছু না হলেও আপনি কেবল ও রকম করে অমঙ্গল ডেকে আন্‌বেন। আপনার বেশী স্নেহ কি না!"—বলিয়া হেরম্ব বাবু দ্রুতবেগে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভৈরব বাবু আপনা আপনি কহিলেন—"ভগবান্‌, যাকে তুমি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাও, স্নেহেরই হউক আর বুদ্ধিরই হোক কোন কথাই তুমি তখন তার কাণে তুলতে দাও না।" বলিতে বলিতে সেই সংসারত্যাগী স্নেহময় ভ্রাতার মুদিত চক্ষুতে ফোঁটাকয়েক জল পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গিনীর দুঃখ

সন্ধ্যার পর অনুপ্রভা মাসীমাকে রামায়ণের সীতার পাতাল প্রবেশের অংশটি পড়িয়া শুনাইতেছে, আর এক একবার অলক্ষিতে মাসীমার অশ্রু-প্লাবিত মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "মা ঠাকরুণ, দুয়োরটা একবার খুলে দিন।"

অনুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা ?" উত্তর আসিল, "আমি ঝি !"

যোগমায়ার অনুমতি লইয়া অনুপ্রভা তখন উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। ঝির সহিত একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

যোগমায়া তখন উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় অবগুণ্ঠনবতী ঘরের ভিতর আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। যোগমায়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র বসন পরিহিতা তাঁহার বিধবা পুত্রবধু—সজল নয়নে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

"বৌমা ! এস মা আমার ! লক্ষ্মী আমার ! তোর এমন বেশ আমায় দেখ্‌তে হ'ল মা !"

বলিয়া যোগমায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুত্রবধূকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সুসঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, আমার কোনও দোষ নেই মা ! এমন যে বাবা করবেন তা আমি কখনও ভাবিনি। মা কত বারণ করে-ছিলেন। আপনি যেন ভাববেন না মা, টাকা পয়সার লোভে আমি এ

সবে মত দিয়েছি। কত দিন থেকে আস্‌ব আস্‌ব বলে হাঁকাচ্ছি, বাবার ভয়ে আসতে পারিনি। আজ তিনি কলকাতা গেছেন, কাল ফির্‌বেন—তাই আজ মাকে বলে এলাম।"

যোগমায়া সস্নেহে বধূর অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন, "তোমার এর জন্যে কোন দোষ নেই বৌমা। কেন তুমি লজ্জা পাচ্চ মা? জীবনের কোনও সাধ মিট্‌ল না; এই বয়সেই দুঃখের বোঝা মাথায় করতে হল তোমায়। তোমার কথা ভেবে যে আমার মনটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর উপর আবার তোমার উপর রাগ কর্‌ব?"

এই স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বধূ অভিভূত হইয়া পড়িল। শাশুড়ীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া সুসঙ্গিনী বলিল, "আমায় কেন মা আপনারা এত দিন আপনাদের কাছে আনিয়ে রাখেন নি? বাবা রাজী নেই বা হলেন? কেন মা আপনারা জোর করে আন্‌লেন না? তাইতে মা অভিমানে আমার জ্ঞান থাকৃত না। নিজে জলে পুড়ে মর্‌তাম, আপনাদেরও জ্বালাতাম। আমায় যত খারাপ ভাবতেন, মা, আমি তত খারাপ ছিলাম না।"

সুসঙ্গিনী মনের আবেগে এতকালকার হৃদয় রুদ্ধ যে কথাগুলি বলিয়া ফেলিল, তাহা শুনিয়া যোগমায়া যেন এতদিনকার অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন। এই তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল যে, তাঁহার বুদ্ধির দোষে কত দিন ধরিয়া এই হতভাগিনী অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কি দুঃখ ও মর্ম্মবেদনায় অভাগিনীর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটাইয়াছে!

যোগমায়া অশ্রুসজল চক্ষে বধূর অশ্রু মুছাইয়া স্নেহভরে পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বৌমা, তোমার কোনও দোষ নেই মা। যা কিছু দোষ আমারই, আর কেঁদ না মা। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি

শান্তি পাও মা। আর, আসছে জন্মে তুমি সর্ব্বসুখে সুখী হবে, এ আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি।"

তার পর শাশুড়ী-পুত্রবধূতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাই হইল। যোগমায়া বুঝিলেন, দুজনে পরস্পরের প্রতি প্রচুর অনুরাগ সত্ত্বেও এক বিপুল অভিমানে দিন কাটাইয়াছে। একজন অভিমানের সেই বিরাট পাষাণ ভার ফেলিয়া চলিয়া গেল, আর একজন কতকাল ধরিয়া সেই আগুনে পুড়িতে থাকিবে তাহা ভগবানই জানেন। তখন একটি একটি করিয়া পুত্রের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা হইতে বৃহৎ ও স্মরণীয় ঘটনাগুলি যাহাতে মৃত্যুশয্যাশায়ী যুবকের স্ত্রীর প্রতি কত না ভালবাসাই মর্ম্মান্তিক ভাবে লুকান ছিল, সে সমস্ত যোগমায়া যখন সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, তখন, আহত স্থান হইতে বিদ্ধ বাণ উঠাইয়া লইলে যেমন সেখান হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতে থাকে, তেমনি সেই অভাগিনী ঐহিক সুখ বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের শত মুখ দিয়া যেন রক্ত ঝরিতে লাগিল।

তার পর যোগমায়া বুঝাইয়া বলিলেন, "শরৎও তোমার মন বুঝত মা, কিন্তু সে যে কেন তোমাকে জোর করে আনবার কথা বলত না, সেইটি তুমি জান্‌তে না। তাকে যে ঐ কাল রোগে ধরেছিল, তা আমাদের বোঝ-বার আগে সে বুঝেছিল। বাবা আমার যাবার ক'দিন আগে বলেছিলেন— এ রোগটায় মা তিল তিল করে মরতে হয়। বুকের কি যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তা আর তোমাকে কি বল্‌ব মা। তাই আমি যাদের ভালবাসি, তাদের কাউকে আমার কাছে আস্‌তে দিতে বা বেশীক্ষণ বস্‌তে বলতে ইচ্ছা করে না। এ যন্ত্রণা যদি তোমার বা বৌয়ের হয়, সে কি ভয়ানক হবে!"

স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতি সুসঙ্গিনীর মন দিন দিন যে কঠিন হইয়াছিল, অশ্রুবর্ষণে তাহা সিক্ত হইয়া আসিতে, হৃদয়নিহিত প্রেমের বীজ আজ যেন

মুহূর্ত্তে অঙ্কুরিত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে শাশুড়ীর পা দুটী ধরিয়া বলিল, "মা, আমি আপনার কাছে আজ থেকে থাকব! আমাকে থাকতে দেবেন না?"

ব্যথিতকণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন,—"ছি মা, অমন কথা কি বলতে আছে! তোমাকে নিয়ে ঘর করব এ যে আমার কত আশ্বাস ছিল, তা আর কি বলব তোমায় মা। ভগবান তা থেকে একেবারে বঞ্চিত করলেন, তার কি করব। কিন্তু এখন তোমার বাবার কাছেই তুমি থাক মা। আমার শরীর তো দেখছ, আজ আছি কাল নেই। এখন যদি তোমার বাবার অমতে চলে এস, তাহলে ভবিষ্যতে তিনি তোমার উপর হয় ত রাগ করে থাকবেন। তাতে তোমার ক্ষতি হবে মা! আমায় যে তুমি এতখানি ভালবাস, এই জন্যে আমি খুব সুখী হয়েছি। শরৎ যাওয়ার পরে তোমাকে যে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার উপায় দিলে, এতেই আমি কৃতার্থ। যদি পার মা, মাঝে মাঝে এক একটিবার আমাকে একটুখানির জন্য দেখা দিয়ে যেও। তাহলেই আমি অনেক শান্তি পাব।"

বলিয়া যোগমায়া সুসঙ্গিনীর চোখের কোণে যে জলটুকু লাগিয়াছিল তাহা মুছাইয়া দিয়া, তাহার চিবুকে হাত দিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

সুসঙ্গিনী তখন উঠিয়া বলিল, "মা একবার এদিকে আসুন।"

পাশেই রান্নাঘর। সেখানে আসিলে সুসঙ্গিনী অঞ্চল হইতে খুলিয়া একশত টাকা করিয়া দশ খানি নোটে হাজার টাকা খাশুড়ীর পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, "মা, এই নোট কখানা জ্যাঠামশায় আপনাকে দেবার জন্য দিয়েছেন। বাবার এই রকম ব্যবহারে তিনি বড়ই লজ্জিত হয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, আমার ভাই যে অন্যায় করেছেন, আমি তার কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

যোগমায়া নোট কয়খানার দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "তোমার

জ্যাঠামশায় একজন সাধুপুরুষ। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো মা, তিনি যেন শুধু আমায় আশীর্ব্বাদ করেন, আর কষ্ট না পাই। এ টাকা তাঁকে ফেরৎ দিও। অশোক আমার ছেলের মত। আর কারও কাছে সাহায্য নিলে সে মনে দুঃখে করবে। তিনি যেন না ভাবেন—যা হ'য়ে গিয়েছে তার জন্য আমি কাউকে গালমন্দ দেবো। আমার অদৃষ্টে ছিল বলে এ সব হ'ল, কারও কোন দোষ নেই মা।"

সুসঙ্গিনী নোটগুলি সেইমত রাখিয়াই বলিল, "জ্যাঠামশায় তাহলে ক্ষুণ্ণ হবেন মা।"

"তুমি বুঝিয়ে বোলো মা, যেন মনে কিছু না করেন। তোমার শ্বশুর একটা ব্যবস্থা করে গেছেন। হিন্দু ফ্যামিলি এন্নুইটি ফণ্ড থেকে মাসে মাসে ১০ টাকা করে পাই, তাতে দুজনের একরকম চলে যায়। বেশী লোভ ত ভাল না মা।"

বলিয়া নোটকয়খানি পুনরায় পুত্রবধূর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

যোগমায়া তখন উঠিয়া, সামান্য কিছু খাবার করিয়া সুসঙ্গিনী ও ঝিটিকে খাওয়াইয়া দিলেন।

তার পর যোগমায়া নিজেই বলিলেন, "রাত হ'ল, আর দেরী কোরো না, এসো মা।"

বাহিরে আসিয়া ঝিটিকে বলিলেন, "তুমি মা বেয়ানকে বোলো, আজ যেমন দয়া করে বৌমাকে একবার পাঠিয়েছিলেন, এমন দয়া যেন মাঝে মাঝে করেন।"

অনুপ্রভা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সুসঙ্গিনী বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে অনুপ্রভা তাহাকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, "বৌদি, তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবার কপাল তো করে আসি নি। তবু এমনি করে মাঝে মাঝে এসো ভাই!"

সুসঙ্গিনী অনুপ্রভাকে হস্তে ধরিয়া তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আস্‌ব বৈ কি ঠাকুরঝি। তুমিও মাঝে মাঝে যেও ভাই।"

বৌদি ও ঠাকুরঝি এই দুটি নূতন সম্বোধন শুনিয়া ও বলিয়া এক নূতন ভাবে সুসঙ্গিনীর সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সামান্য দুটি কথায় কেন যে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, কেনই বা তাহার দুটি চক্ষে এমন করিয়া জল ভরিয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

সুসঙ্গিনী এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া রোয়াকে শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া ঝিয়ের সঙ্গে বাটীর বাহিরে আসিল। বাড়ী যাইবার পথে এক কথাই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ যদি তিনি থাকিতেন, তাঁর পায়ে ধরিয়া বলিতাম—ওগো, আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই, তাই কত ব্যথা দিয়াছি, আমায় ক্ষমা করিও।

ঝিয়ের অলক্ষিতে সুসঙ্গিনী বারবার চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভৈরব বাবু

সুসঙ্গিনী শাশুড়ীর সহিত দেখা করিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে এক-দিন অপরাহ্ণে হেরম্ববাবুর দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র সুধীর আসিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায় বাইরে এসেছেন। আপনাদের বাইরের ঘরে বোসে, আপনাকে গোটাকতক কথা বলে যাবেন। আসতে পারেন তিনি ?"

"হ্যাঁ, আসবেন কৈ কি বাবা। নিয়ে এস তাঁকে।" বলিয়া যোগমায়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া সুধীরকে তাহার জ্যাঠামহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জ্যাঠামহাশয়কে ডাকিয়া সুধীর তাঁহাকে বাহিরের ঘরে বসাইল।

জ্যাঠামহাশয়ের গেরুয়া বসন পরিহিত দীর্ঘ গৌর দেহ ও প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল দেখিয়া যোগমায়া কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি বলবেন বলুন।"

ভৈরববাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, সেজন্যে তুমি বলেই কথা আরম্ভ করলাম, কিছু মনে করো না। আমি যে দুটি কারণে তোমার কাছে এসেছি মা, তা এক এক করে বলছি।"

বলিয়া সুধীরকে একবার ডাকিলেন। সুধীর জ্যাঠামহাশয়কে বসাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরকার একটা পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল যে, যাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের কিছু না বলিয়া গাছে উঠিয়া পড়াটা উচিত

হইবে কি না। এমন সময় জ্যাঠামহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া আপাততঃ সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সুধীরকে দেখিয়া ভৈরব বলিলেন, "সুধীর, এঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নাও।" তার পর যোগমায়ার সামনে যাইয়া বলিলেন, "মা, আমার প্রথম অনুরোধ, তুমি এই বালককে আশীর্ব্বাদ কর।"

যোগমায়া বালককে সস্নেহে দীর্ঘজীবন ও বিদ্যাসমৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠাইলেন।

সুধীর তখন আবার পেয়ারার অভিযানে বাহির হইয়া পড়িল।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া ভৈরব বাবু বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার ভাই যে ব্যবহার করেছে, তাতে আমার তোমার কাছে আসতে লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি এসেছি তার হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। সে নিজের জিনিস নিজের স্বার্থ এতবড় করে দেখছে যে, আর কারো একান্ত স্বার্থ তার নজরেই পড়ছে না। এতে তো তার কল্যাণ হবে না মা। সে যা করেছে তার মার্জ্জনা নেই। তবু মা তোমাকে আমি চিনি, তাই তার এতবড় অপরাধের জন্যেও ক্ষমা চাইতে সাহস করছি। তাকে তুমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করো মা, তাহলে তার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।"

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি আপনাকে সত্যি বলছি, তাঁর উপরে আমার কোন আক্রোশ নেই। তিনি যা করেছেন, তাঁর ছেলের ভাল ভেবেই। এতে করে তিনি আমার ভালও করেছেন। স্বামী পুত্র হারিয়ে তাঁদের সম্পত্তি নিয়েই মত্ত হয়েছিলাম। এটা তো ভাল হচ্ছিল না। তাই ভগবানই ওঁর হাত দিয়ে সে সব কেড়ে নিলেন। তিনি আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এতে আমার মঙ্গল নেই। বৌমার বাপের এতে কোন দোষ নেই।"

ভৈরব বাবুর মুখমণ্ডল একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,

"তুমি যে এ দুঃখটাকে এমন সহজ করে নিতে পেরেছ, এতে বড় সুখী হলাম মা। ওই তো চাই। এর চেয়ে বড় সাধনা তো খুব কমই আছে। তিনি যা দেবেন সবই আমার মঙ্গলের জন্যে, এটুকু মনে গ্রহণ করতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকবে না।"

যোগমায়া আপনার প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিলেন।

ভৈরব বাবু আবার বলিলেন, "কিন্তু মা, একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করবার আছে। সুহূর হাত দিয়ে যে কাগজ কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তা নেওনি কেন মা? কেন মনে করতে পারছ না যে ভগবান আমার হাত দিয়ে তোমাকে ওই জিনিসটা পাঠিয়ে দিলেন?"

যোগমায়া নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "তা যদি দেবেন, তাহলে যেগুলি আমি আমার বলতাম, সেগুলি হাত থেকে সরিয়ে নিলেন কেন? বোধ হয় ভগবান আমাকে অভাবেই রাখতে চান। সে অবস্থাতে আপনার টাকা নেওয়াটা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত হবে না কি? আর যতই পাব, ততই তো লোভ বেড়ে যাবে।"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "কিন্তু মা তোমার যে এখন টাকার দরকার। তোমার কাছে যে মেয়েটি রয়েছে, তার যে বিয়ে দিতে হবে।"

যোগমায়া। আমার বাবার ভাগলপুরে যে বাড়ী আছে তা ওই পাবে, খান দুয়েক গহনাও ওর গায়ে আছে। এই থেকে তাঁর দয়া হলে একরকম চলে যাবে।

ভৈরব বাবু এবার একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তা'হলে মা, আমাকে এমনিই ফিরিয়ে দেবে?"

যোগমায়াও একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর রাগ করবেন না বাবা। আমার স্বামী একটা ব্যবস্থা করে গেছেন, তার থেকে আমি মাসে দশ টাকা করে পাই। মোটামুটি ভাবে চলতে পারলে

এতেই কুলোনো উচিত। বেশী লোভ করাটা গর্হিত, তাই আমি আপনার অর্থ সাহায্য নিচ্ছি না। তবে যদি আমার কখনো দরকার হয়, তাহলে আমি নিঃসংকোচে আপনাকে জানাব, এ কথা বলে রাখছি।"

"তাহলে মা, তোমার কখনও যদি দরকার হয়, আমাকে বৃন্দাবন ধাম, হরিদাস বাবাজীর আশ্রম, এই ঠিকানায় জানিও। তাহলে যেখানেই আমি থাকিনা কেন, খবর পাব। এখন তবে উঠি মা।"

বলিয়া ভৈরব বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যোগমায়া ভৈরব বাবুকে আর একবার প্রণাম করিলেন। ভৈরব বাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "শ্রীভগবানের চরণে তোমার অচলা মতি হউক মা। তোমার চরিত্র লোকের আদর্শ হোক।"

হাঁ, মায়ের মত মা বটে। মণির দুর্ভাগ্য যে এঁর সঙ্গে তার বিবাদ করতে হ'ল। এমন শাশুড়ীর কাছে মেয়েকে রাখতে পারলে না সে!

ভাবিতে ভাবিতে ভৈরব বাবু বাসায় আসিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অশোক ও অনুপ্রভা

প্রভাতে অশোক যোগমায়ার নূতন বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল, "খুড়িমা।"

অনুপ্রভা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "অশোক দা, আসুন।" তার পর ঘরের ভিতর হইতে একখানি আসন আনিয়া বসিতে দিয়া কহিল, "মাসীমা গঙ্গায় নাইতে গেছেন, এলেন বোলে।"

অনুপ্রভার সহিত কথা কওয়া আজ তার প্রথম, তাই কিসের একটা আনন্দ ও ভয়ে অশোকের বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

অশোক কহিল, "এত সকালে এই শীতে নাইতে গেছেন!"

অনুপ্রভা। মাসীমা তো বারমাস সকালেই না'ন; আর উনি শরীরকে কত কষ্টই যে সওয়াচ্ছেন, বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না। মাসীমার মত মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি। এ কি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

অশোক আসনে বসিয়া কহিল, "খুড়িমার মত মানুষ পাওয়া সত্যই দুর্লভ। আমার মনে হয় খুড়িমার স্নেহ পাওয়া একটা সৌভাগ্য। অথচ এ স্নেহ পেয়ে মনে হয় না যে আমি একাই এ ভোগ করি। আর কাউকে ভাগ দিতে পারলে যেন আরও ভাল লাগে। যেমন তোমাকেও তো খুড়িমা ভালবাসেন, কিন্তু তার জন্যে কোন ঈর্ষা হয় না।" বলিয়া অশোক অনুপ্রভার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

অনুপ্রভাও নত মস্তকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তো

কাল এলেন না। মাসীমা সন্ধ্যার সময় বল্‌ছিলেন, আপনি বোধ হয় আস্‌বেন।”

অশোক এই কথাটাতেও একটা কি রকম আনন্দ অনুভব করিল। কয়েকমাস হইল অনুপ্রভা এখানে আসিয়াছে এবং এই কয়মাস সে এই পিতৃমাতৃহীনা কিশোরীর সংকোচহীন ব্যবহার, সংযত ও স্নিগ্ধ কথাবার্ত্তা, সুনিপুণ ও সস্নেহ পরিচর্য্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আজিকার এই কথাটায় তাহার মনে হইল, বোধ হয় অনুপ্রভাও খুড়িমার সহিত তাহার প্রতীক্ষায় ছিল।

এই কথাটুকুতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া অশোক বলিল, “আমাদের তো সে রকম কলেজ নয় যে শনিবার কলেজ হলেই ছুটি হবে আবার সোমবার খুলিবে। আমাদের রবিবারেও কাজ করতে হয়।”

অনুপ্রভা অশোকের পানে তাহার শান্ত সরল চোখ ছুটি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তাহলে আপনি কি করে বাড়ী আসেন?”

অশোক উত্তর দিল, “দরকার পড়লেই আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়। তাও একটা দিন বা একটা রাত্তিরের বেশী আজকাল ছুটি মেলে না।”

দুজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর অশোক জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তোমার আর সে দেশের জন্য মন কেমন করে না!”

কথাটা একটু অতর্কিত হওয়ায় অনুপ্রভা একবার চমকিত হইয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “সেখানে আর কে আছে যে মন কেমন করবে। মা বাবার আর দাদামহাশয়ের কথা মনে হ'লে বড় কষ্ট হয়।”

বলিতে বলিতে অনুপ্রভার চক্ষু হইতে বড় বড় কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অনুপ্রভাকে কাঁদিতে দেখিয়া অশোক বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত

হইল। সে ভাবিল ঐরূপ প্রশ্নে যে অনুপ্রভার কষ্ট হইবে তাহা পূর্ব্বেই তাহার ভাবা উচিত ছিল।

অশোক কুণ্ঠিত হইয়া কহিল "আমার একথাটা তোলা বড় অন্যায় হয়ে গেছে অনু। তুমি কিছু মনে কোরো না।"

তারপর একটু সান্ত্বনা দিয়া শান্তভাবে কহিল, "এদুঃখ তো সবার জন্য সাঞ্চত আছে। একদিন না একদিন পেতেই হবে।"

অনুপ্রভা চোখের জল মুছিয়া কহিল, "প্রায় এক সঙ্গেই আমার সবটাও দুঃখগুলি পেতে হ'ল তাই বড় কষ্ট হয়। বাবা মাকে বলতেন অনুকে না বেশ ভাল করে লেখাপড়া শেখাব, ওকে যেন খুব গুছিয়ে খানি সংসা অত কায দিয়ে ঘিরে ফেলোনা। কায তো বড় হলে করবেই, কিন্তু ত বলে, হয়ত লেখাপড়া করবার সময় আর পাবে না। মা আমার বাবার কথা এমন মানতেন যে পারতপক্ষে আমাকে তিনি কোন কায করতেই দিতেন না। শেষে বাবাকে আবার বলতে হ'ত কাযটাও তো শেখা দরকার, একটু একটু কাযও শিখিও।"

বলিয়া অনুপ্রভা স্বর্গগত জনক-জননীর অসীম স্নেহের কথা ভাবিয়া আর একবার অশ্রু মুছিল।

অনুপ্রভার অশ্রু-বিন্দুগুলি যেন তীক্ষ্ণকণ্টকের মত অশোকের বক্ষে বিঁধিতে লাগিল। স্নেহের সহিত একটা বিরাট সহানুভূতির ঢেউ তাহার হৃদয়ের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। সান্ত্বনার দুটি মিষ্ট কথা বলিবার জন্য তাহার সমস্ত মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু লজ্জায় সে ভাবের কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

কথাটা অন্যদিকে উলটাইয়া লইবার জন্য শেষে অশোক কহিল, "তোমার কাকাদের কাছে থাকার চেয়ে এখানে ভাল আছ তো?"

অনুপ্রভা আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "তা খুব আছি। মাসীমার কাছে মায়ের

মতই স্নেহ পাচ্ছি। আর বাবা মারা গেলে সেখানে যে কটা দিন মা ছিলেন, কি কষ্টই তিনি পেয়েছিলেন। তবে মাসীমার মতই তিনি কোন কষ্ট পেয়ে বলতেন না, তাই এক রকমে কেটে যেত। কিন্তু সেই অবস্থাতেও বাবার ইচ্ছা বলে আমাকে ঠিক ভাবে পড়াশুনো করতে দিতেন। না পড়লে দুঃখ করতেন। কাকারা কত সেই জন্যে নিন্দা করতেন, দুর্ব্বাক্য বলতেন, তিনি গ্রাহ্য করতেন না; কোন উত্তরও দিতেন না। আমি যদি বলতাম মা, এখন এই দুর্দ্দশা হ'ল, আর ওসব কেন? মার ছিল দুটো সজল হয়ে উঠতো, আর আমার পানে চেয়ে বলতেন র ইচ্ছা ছিল তুমি ভাল করে লেখাপড়া শেখ; আমার যতদূর বধ, তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে নইলে যে আমি শান্তি পাব না মা।"

অশোক মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা মারা যাবার কত পরে তোমার মা মারা গেছেন?"

অনুপ্রভা মৃদুস্বরে বলিল, "ছমাস পরে। ডাক্তার বলেছিলেন বাবার কথা ভেবে ভেবেই মা মারা গেলেন। মা যাবার সময় বলে যান, এখানে আর থেকো না মা, তোমার মাসীমার কাছে গিয়ে থেকো; তা'হলে আর ভাবনা থাকবে না।"

অশোক অনুপ্রভার মায়ের সম্বন্ধে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় যোগমায়া গঙ্গাস্নান করিয়া আর্দ্রবসনে ফিরিয়া অশোককে দেখিয়া বলিলেন, "অশোক যে! কতক্ষণ এসেছিস বাবা?"

অশোক বলিল, "প্রায় আধঘণ্টা হ'ল এসেছি খুড়িমা! আচ্ছা খুড়িমা, এত শীতে তুমি একখানা শুকনো কাপড় কেন নিয়ে যাওনা? হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যে অসুখ করবে।"

যোগমায়া একঘটি জল লইয়া পা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "এখনও

ডাক্তার হ'সনি, এরি মধ্যেই আরম্ভ করলি বাবা! কিন্তু অভ্যাসে সব সহ্য হয় এটা তো মানিস্?"

অশোক। কিছু কিছু হয় তা মানি। তা বলে শীতের সকালে একেবারে আধক্রোশ হেঁটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে, তার পর খালি গায়ে থাকলে শরীর বেশী দিন সহ্য করবে না, তাও মানতে হবে।

যোগমায়া। দেখ্ অশোক, ডাক্তার হয়ে শুধু রোগ হলে তার চিকিৎসা কি করতে হবে এটা শিখিস্‌নে। কি হলে রোগ বেশী হবে না সেটাও দেখা দরকার। আমার মনে হয় ঠাণ্ডা, জল বা বাতাসকে অত ভয় না করে সব যদি একটু সইয়ে নেওয়া যায় তো তার ফল খুব ভাল হয়। অত সহজে সর্দ্দি লাগে না, অসুখও করে না। তুই বাবা, সবাই যা বলে, অন্ধের মত তা শুনে যাস্‌নে, নিজে একটু ভেবে নতুন নতুন বিষয় সন্ধান করে আমাদের দেশের চিকিৎশাস্ত্রের সঙ্গে তাদের চিকিৎসাশাস্ত্র মিলিয়ে একটা নতুন সত্যিকার সুস্থ থাকবার উপায় বার কর।

অশোক যোগমায়ার কথাগুলি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা সব সত্যি খুড়িমা। তবু তুমি কাপড় ছেড়ে এসে কথা কও। তুমি এই শীতে তোমার ভিজে কাপড়ে কথা কইছ, আর আমার বুকের ভিতর যেন কাঁপুনি হচ্ছে।"

যোগমায়া ঘরের ভিতর গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলেন। অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে অশোক, তুই তো তাহলে এই আস্‌ছিস সবে কল্‌কাতা থেকে। একটু চা করে এনে দিক।"

অশোক একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা আমি তো তোমাকে বলিনি যে আমি এখ্‌খুনি আসছি, কেমন করে তুমি জানলে?"

যোগমায়া বলিলেন, "শরৎ যাবার পর থেকে তুই যে আগে আমাকে দেখে তবে বাড়ীতে যাস। কাল রাত্রে এলে অবশ্যই আস্‌তিস্।"

অনুপ্রভা ততক্ষণ উঠিয়া গিয়াছিল। সে মনে মনে এই ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল যে চায়ের কথাটা তাহার আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল।

অশোক বলিল, "খুড়িমা তোমার যে এখন আহ্নিকের সময়। আহ্নিকটা সেরে এস, আমি ততক্ষণ বসি।"

যোগমায়া বলিলেন, "সে পরে হবে'খন বাবা। তোর সঙ্গে দুটো কথা কই আগে। এখন আহ্নিকে গেলে ত তোরই কথা মনে হবে, ভগবানের দিকে ত মন যাবে না।"

এই কথাতে অশোকের প্রতি যোগমায়ার যে স্নেহ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহা অশোক মনে মনে বুঝিয়া বড় আনন্দ লাভ করিল।

যোগমায়া যেন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্ বাবা এবার থেকে একটা কথা বল্‌ব ভেবে রেখেছি। অনুর বয়স ত ১৫ হ'ল। এবার একটা সম্বন্ধের চেষ্টা ভাল করে কর, আর দেরী করা ভাল নয়।"

কি কারণে তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু কথাটা শুনিবামাত্র তাহা যেন একটা আঘাতের মতই অশোকের কাণে বেদনা দিল। একটু সামলাইয়া দেরীতে বলিল, "হাঁ দেখব খুড়িমা। কিন্তু তাড়াতাড়ি অনুর বিয়ে হয়ে গেলে তোমার যে একলা থাকতে হবে।"

যোগমায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা বলে আর উপায় কি বাবা? আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি চোখ বুজলে তখন যে আরও মুস্কিল হবে।"

আর একটু পরে অনুপ্রভা চা লইয়া আসিল।

"বাঃ সুন্দর রং হয়েছে তো?" বলিয়া অশোক চা লইয়া ধীরে ধীরে পান করিল।

তারপর উঠিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া কহিল, "তা হলে এখন উঠি খুড়িমা, আবার বিকালের দিকে আসবো'খন।"

পথে বাহির হইয়া অশোক ভাবিতে লাগিল—অনুর বিবাহের কথায় তাহার মনটার ভিতরটা কেন ঐরকম বেদনা বাজিল! সে যে অনুকে নিজে বিবাহ করিবে এমন কথা কোন দিন মনে করে নাই। কিন্তু তাহাকেও বিবাহ ত একদিন করিতে হইবে। হাঁ, বিবাহ করিবার যোগ্য পাত্রী বটে।

তারপর সে মনে মনে কহিল—যাহার সহিত অনুর বিবাহ হউক না কেন, সে যেন যোগ্যপাত্রে পড়ে; কখনও কষ্ট যেন না পায়। ভগবান অনুপ্রভাকে যেন সর্ব্বসুখে সুখিনী করেন। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বন্ধু সম্মিলন

বৈশাখের অপরাহ্ণ। অতুলকৃষ্ণ অন্তঃপুরে বসিয়া জলযোগ করিতেছেন, সম্মুখে বসিয়া সরস্বতী দেবী পাখা করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ ভৃত্য সলম আসিয়া সংবাদ দিল—"কে একজন বাবু এসে আপনার খোঁজ করছেন। বল্লেন, বাবুকে এখনি পাঠিয়ে দাও। বলগে গিরিশ বাবু এসেছেন।"

আহার বন্ধ করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অতুলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ? কোন গিরিশ? কি রকম চেহারা বল দেখি?"

সলম বলিল, "আমি আর কিছুতো জিজ্ঞাসা করিনি তিনিও বলেন নি। খুব জোয়ান চেহারা, দাড়ী আছে। সঙ্গে করে একটা কুকুর এনেছেন।"

"কুকুর সঙ্গে আছে ত? তবে ঠিক গিরিশ বটে! ঠিক বিশ বছর পরে এসেছে।"

বলিয়া জলযোগ এক প্রকার অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

পত্নীর ঈষৎ অনুযোগের সুর কাণে পৌছিতে না পৌছিতেই অতুলকৃষ্ণ হাত মুখ ধুইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ প্রৌঢ় ভদ্রলোক পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় অতুলকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক পদশব্দে চকিত হইয়া অতুলকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র "অতুল" বলিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। অতুলকৃষ্ণও 'গিরিশ' বলিয়া সেই দিকে গেলেন।

দুই বন্ধু আপনাদের বয়স স্থান কাল ভুলিয়া পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

তারপর দুইজনের অফুরন্ত কথা। সে যেন নির্ঝরের মত। তাহার কলনাদ আর জলোচ্ছ্বাস যেন ফুরায় না।

দুইজন সিটিকলেজে একসঙ্গে দুইবৎসর পড়িয়াছিলেন। যৌবনের প্রথম উন্মেষে কোন্ মুহূর্ত্তে যে সেই দুটি যুবকের হৃদয়ে বন্ধুত্বের শতদল প্রথম বিকসিত হইয়াছিল, এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের অদর্শনেও হৃদয়ের মধ্যে তাহা তেমনি অম্লান রহিয়াছে।

বি-এ পাশের পর অতুলকৃষ্ণ কলেজপাঠ সাঙ্গ করিয়া দেশে আসিয়া পৈতৃক জমিদারীতে মনোনিবেশ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের তখন ইঞ্জি-নীয়ারিং শিখিবার আগ্রহ জন্মিল। পঠদ্দশাতেই অতুলকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। সহসা বিবাহ করিয়া ফেলা গিরিশের মত নহে। সেজন্য গিরিশ অনেক আপত্তি করিয়া তবে বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাহার বৎসর দুই পরে গিরিশের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। বিবাহের ভয়ে গিরিশ ঠিক করিয়াছিল যে সে ইঞ্জিনীয়ারিং ফেলিয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিবে। শেষে অতুলকৃষ্ণের কথায় সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল। সেই সময়ে দুই বন্ধুতে কথা হইয়াছিল যে তাঁহাদের পুত্র ও কন্যা হইলে পরস্পরের সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবে।

তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সরকারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উপরিওয়ালাদের মনস্তুষ্টি করিতে না পারায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বনিবনাও হইল না। শেষে একদিন উৎপাত সহিতে না পারিয়া চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে গিরিশের পিতার মৃত্যু হইল। মাতার মৃত্যু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুখ ফুটিয়া পৃথক হইবার কথা না বলিতে পারিয়া তিনি

তাঁহার সহিত এমন খুটিনাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, গিরিশ শেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ী ঘর বিষয় আশয় পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে একেবারে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হন। সেথানে এক এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনীয়ারকে কার্য্যে সন্তুষ্ট করিয়া কণ্ট্রাক্টারি আরম্ভ করিয়া অর্থ ও সুনাম ও ক্রমে গুটী কয়েক কন্যা লাভ করেন। বড় মেয়েটীর বয়স যখন ১৪ বৎসরে গিয়া পড়িল, তখন মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া প্রথমেই দেখা করিতে আসিয়াছেন বন্ধু অতুলকৃষ্ণের সহিত। অন্তঃপুরে সংবাদ পৌছিল কর্ত্তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আসিয়াছেন। খুব ঘটা করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা হইল। গিরিশ নিজহস্তে তাঁহার কুকুরটীকে খাওয়াইয়া তাহার পর বন্ধুর সহিত আহারে বসিলেন।

দুই বন্ধু রাত্রে এক শয্যায় শয়ন করিলেন। অনেক কথার পর *গিরিশ অতুলকৃষ্ণের কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতুল, মনে আছে? মত বদলায় নি তো?"*

অতুলকৃষ্ণের মনেও সেই বিবাহের প্রতিজ্ঞা বন্ধুকে দেখিবামাত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গিরিশ কথাটা তোলেন নাই বলিয়া তিনিও সাহস করিয়া তুলিতে পারেন নাই। এতক্ষণ পরে বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিবামাত্র সোৎসাহে বলিলেন, "খুব মনে আছে। সে মত কি বদলায়?"

গিরিশ। সুরলতার বয়স এখন ১৫ বৎসর। এখন কেমন হয়েছে একবার দেখবে?

অতুল। উঁহু। তোমার মেয়ে এই যথেষ্ট। অশোকের বয়স কুড়ি একুশ। আস্‌তে লিখব?

গিরিশ। কিছু দরকার নেই। সুরো দেখতে অবিকল তার মায়ের মত হয়েছে এখন।

অতুল। অশোকের ভাগ্য প্রসন্ন। সে হচ্ছে ঠিক আমার মত।

গিরিশ। মেয়েটার ভাগ্য।

তাহার পর দুই বন্ধু হাতে হাত দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় আড়াই মাস পরেই বর্মা রওনা হতে হবে। কবে বিয়ে দেবে?"

অতুলকৃষ্ণ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই কহিলেন, "তোমার যেদিন ইচ্ছা।"

তারপর দুই বন্ধু সেই পুরাতন দিনের কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগমায়ার মৃত্যু

"অমু, জানালাটা খুলে দেতো মা ; আর একটু বাতাস আসুক।"

অমুপ্রভা মাসীমার কথা শুনিয়া উচ্ছলিত রোদন সংবরণ করিতে করিতে জানালা খুলিয়া দিল।

অশোক শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, কি কষ্ট হচ্ছে এখন ?"

যোগমায়ার মুখ দিয়া সহসা উত্তর বাহির হইল না। একটু চেষ্টা করিয়া কিসের আবেগ দমন করিয়া লইলেন। পরে অমুপ্রভা ও অশোকের দিকে চাহিয়া অতিমৃদু স্বরে বলিলেন, "কষ্ট সবই ত কমে আসছে, আসবেও। শুধু অমুর কথা ভেবে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে।"

যোগমায়া হঠাৎ এতদিন পরে স্বামীপুত্রের সহিত মিলনের পথ ধরিয়াছেন। তিনি একদিন সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। অমুপ্রভা অশোকের মাকে সংবাদ দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এক সপ্তাহ যোগমায়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজ লক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন, উহা একজাতীয় থাইসিস্ যাহাতে সপ্তাহ-মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে। উহার কার্য্য ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ একদিন প্রকাশলাভ করে। মাতার নিকট সংবাদ পাইয়া গত কল্য অশোক কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে।

এই দুই দিন ও দুই রাত্রি অশোক ও অমুপ্রভা একত্র রহিয়া

যোগমায়াকে শুশ্রূষা করিয়াছে ও প্রতিক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছে এখনি বুঝি এই ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, সীতার মত সাধ্বী ও দুঃখভাগিনী, ঈশ্বরে নির্ভরশীলা নারীর ইহজীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। আজ সমস্ত রাত্রি অভিভূতার মত থাকিয়া, রাত্রি দুটার সময় যোগমায়া উক্ত কথা কয়টা কহিলেন।

যোগমায়া কি ভাবিয়া এই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও শান্তি পাইতেছেন না, তাহা কিছু কিছু বুঝিলেও, সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্য অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, কি ভেবে আপনি সোয়াস্তি পাচ্ছেন না আমাকে বলুন।"

যোগমায়া ইঙ্গিতে অশোককে আরও কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তো মরে বাঁচব অশোক! কিন্তু মেয়েটার কি হবে বাবা? আগে ভাবতাম মরণ যখন আসবে তখন কোন আপশোষ রইবে না। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগমায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিতে যেটুকু বাকি ছিল, চোখে যে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল সেই অশ্রুবর্ষণে তাহা সম্পূর্ণ হইল।

অশোক যোগমায়াকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "খুড়িমা, আপনি এখন ও চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি, আজ থেকে অনুর সব ভার আমার।"

শয্যার এক পার্শ্বে অনুপ্রভা বসিয়া ছিল। অশোকের কথা শেষ হইবামাত্র কি ভাবিয়া তাহার কণ্ঠমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

যোগমায়া অশোকের ভরসার কথা শুনিয়া ও অনুপ্রভার আনত মুখের পানে চাহিয়া উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বাবা অশোক, মরবার সময় আজ আমাকে যে কি আনন্দ দিলি তা আর তোকে কি

বলব ! তুই যখন ওর ভার নিলি, ওর আর ভাবনা নেই—আমি নিশ্চিন্ত। তোর পায়ে যে ওর ঠাঁই হবে এ আমি ভাবতেও পারি নি। আশীর্ব্বাদ করি ও যেন সর্ব্বাংশে তোর যোগ্য হয়।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে অশোকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে এমন কি কথা বলিয়া ফেলিল যাহাতে যোগমায়া স্থির করিয়া লইলেন যে সে অনুপ্রভাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল? অনুপ্রভার লজ্জানত আরক্ত মুখ দেখিয়া অশোক বুঝিল, সেও কথাটা ওই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে।

একবার অশোক বলিতে চাহিল,—খুড়িমা আমি অনুকে নিজে বিবাহ করিব এমন কথা ত বলি নাই, তাহার ভাল একটি বিবাহ দিবার, অবিবাহিতা অবস্থায় উহাকে রক্ষা করিবার ভার আমার এই কথাই আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম।—কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িতা যোগমায়ার অবসন্ন ও পাণ্ডুর মুখে ঐ কথার ভ্রান্ত অর্থে যে শান্তি ও নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং অনুপ্রভার লজ্জারক্ত মুখে যে আনন্দের আভাস জাগিয়াছিল, তাহা একটা সত্যের আঘাতে চূর্ণ করিতে গিয়া তাহাকে থামিয়া পড়িতে হইল। হয়ত এই রাত্রিটার পরেই যে বক্ষ স্তব্ধ হইয়া যাইবে, তাহাতে মৃত্যুর অধিক আঘাত দিয়া ফল কি? আর অনুপ্রভার সম্মুখে এই অসঙ্গত কথাটা বলা কি নিতান্তই বর্ব্বরতা হইবে না?

অশোক নতমুখে যখন এই কথাগুলি ভাবিতেছিল, যোগমায়া ভাবিলেন বিবাহের কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অশোক ঈষৎ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে যোগমায়ার দুর্ব্বল বক্ষ বার বার স্পন্দিত হইতেছিল। অনুপ্রভাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া তাঁহার ডান হাতখানি দুজনের মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হাতখানি লুটাইয়া পড়িল। অশোক ও অনুপ্রভা দুইজনে "কি হ'ল" বলিয়া যোগমায়ার মুখের পানে ঝুঁকিয়া পড়িল। অশোক যোগমায়াকে ডাকিতে গিয়া দেখিল এতদিন পরে তিনি স্বামী ও

পুত্র শোকের বেদনা এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

বিদ্যুতের মত এই কথাটা অশোকের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল,—যে কথাটার আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ইনি সংসার হইতে চলিয়া গেলেন তাহার কি হইবে? তখন অম্বুপ্রভা যোগমায়ার সদ্য মৃত দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,—"মাসীমা আমার কি হবে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাল্য প্রতিজ্ঞা

শরৎ অশোকের অতি নিকটতম বন্ধু, তাই শরতের মায়ের মৃত্যুর পর অশোকের মাতা সরস্বতী দেবী নিজে যাইয়া শোকাতুরা অনুপ্রভাকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন এবং তিন দিন পরে শাস্ত্রানুমোদিত তাহার চতুর্থীর শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া দিলেন।

যোগমায়ার মৃত্যুর এক দিবস পরেই অশোককে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইয়াছিল। যোগমায়ার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে প্রকারান্তরে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিণাম যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া সে কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই।

যেদিন চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সেইদিন অতুলকৃষ্ণ বাহির হইতে একখানা চিঠি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর সহিত অনুপ্রভাকে মলিন মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তুমি কিছু সঙ্কোচ কোরো না মা। এ তোমার নিজের বাড়ী মনে করে থেকো।"

তার পর পত্নীকে বলিলেন, "দেখ, গিরিশ চিঠি লিখেছে যে আষাঢ়ের প্রথমেই সে বিবাহ দিয়ে ফেলতে চায়, কারণ তাকে আষাঢ়ের শেষেই বর্ম্মা রওনা হতে হবে। অশোক জ্যেষ্ঠ ছেলে বলে জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমরা ত বিবাহ দিতে চাও নি। তাহলে এই আষাঢ় মাসেই ঠিক বলে লিখে দেওয়া যাক্?

গৃহিণী শুধু অনুমোদনসূচক একবার ঘাড় নাড়িলেন। স্বামীর ইচ্ছা

হইতে যে তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিতে পারে ইহা তিনি কখনও সম্ভব মনে করিতেন না।

তখন দুইজনে অশোকের বিবাহ, ভাবী বধূ ও গিরিশ সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল।

অনুপ্রভা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অশোকদের বাড়ীতে যখন আসিয়াছিল, তখন সে মাতৃসমা মাসীমার বিয়োগদুঃখের মধ্যেও এই আনন্দটুকু পাইয়াছিল যে, যিনি স্নেহচক্ষে অনুকম্পা ভরে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারই সমীপে আজ সে চলিয়াছে।

মাসীমার কাছে আসিয়া অবধি সে অশোককে দেখিয়া আসিতেছে। অশোকের অন্যায়-অসহিষ্ণুতা, তাহার ন্যায়নিষ্ঠা, মাসীমার প্রতি তাহার ভক্তি ও মাসীমাকে সেবা করিতে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা—এ সমস্ত দেখিয়া অশোকের প্রতি তাহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই যে মাসীমার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে অশোকের কাছে বসাইয়া তাহাদের দুইজনের ভবিষ্যমিলনের কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, তাহার পর হইতে সবই যেন প্রথম অরুণোদয়ের রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সেই ক্ষণে তাহার সেই নবোদ্ভিন্ন হৃদয় যে অশোকের চরণে প্রণত হইয়া পড়িয়াছিল এখনও পর্য্যন্ত সে হৃদয় সেই ভাবেই রহিয়াছে। এবং সেই প্রিয়দর্শন উদার যুবক স্নেহভরে তাহাকে হৃদয়ের কাছে যে তুলিয়া ধরিবে তাহাতে আর অনুপ্রভার কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু আজ এইখানে বসিয়া সস্নেহ সান্ত্বনার অব্যবহিত পরেই সে এ কি কথা শুনিল? তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! কৈ তিনি তো মাসীমাকে এসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সে কি, মাসীমা দুঃখ পাইবেন বলিয়া? তাহা হইলে আমার সম্মুখে তিনি ও কথাটা অমন করিয়া কেন বলিলেন?

লজ্জায় অনুপ্রভার মুখখানি মলিন হইয়া উঠিল। তবে সে এখানে কিসের জোরে আর থাকিবে ?

এমন সময় সরস্বতী স্বামীকে বলিলেন, "তাহলে অশোককে একটা খবর দাও সে একবার আসুক। সে তো কিছু জানে না।"

অতুলকৃষ্ণ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার যখন বিবাহ হয়, তার ছুদিন আগে তো আমি খবর পেয়েছিলেম, তাতে কি আর কোন ক্ষতি হয়েছিল ?"

সরস্বতী বলিলেন, "আমাদের সময় তো প্রায় কেটে গেল। এখন এরা সব নতুন, এদের নিয়মও নতুন হবে।"

একটু গম্ভীর হইয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি কি মনে কর অশোককে আগে থাকৃতে না বল্লে সে কোন আপত্তি করতে পারে ?"

সরস্বতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, তা কেন করবে ? সে তেমন ছেলে নয়। তবে খবরটা দেওয়া ভাল তাই বলছিলাম।"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা তাকে আসছে রবিবারে বাড়ী আসতে লিখি।"

গৃহিনী মনে মনে কিন্তু একটা আশঙ্কা করিতেছিলেন। পুত্রের মনে যে একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছে তাহা স্বামী না বুঝিলেও তিনি জানিয়াছিলেন এবং সে আশঙ্কার স্থান যে কোথায় তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী ছিল না। অনুপ্রভা এখানে আসিবার পর অশোক যে একটা দিন বাড়ী ছিল, তাহার মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অশোক নিকটে আসিলেই অনুপ্রভার মুখভাবে বেশ একটু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এবং মাসখানেক হইতে পুত্রের যে ভাবান্তর কিছু ঘটিয়াছিল ইহাও তিনি অনুমান করিয়াছিলেন।

আজ অনুপ্রভাকে দেখিয়া তাঁহার একটিবার মনে হইয়াছিল—এমন একটি পুত্রবধু পাইলে বেশ হয়। প্রায় একই সময়ে গিরিশের কন্তার

সহিত সম্বন্ধ ও অনুপ্রভার কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মন একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। একটা শঙ্কাও জাগিতেছিল—শেষটা কি ইহার সহিত একটা অমঙ্গলের উৎপত্তি হইবে?

ইহার পরদিন সন্ধ্যাকালে অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরস্বতীকে বলিল, "মা, আমাকে একবার কাকাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।"

প্রশ্নের মধ্যে একটা দুঃখ ও হতাশার সুরে চমকিত হইয়া সরস্বতী বলিলেন, "কেন মা, তোমার এখানে কষ্ট হচ্চে?"

অনুপ্রভা বলিল, "মা গেলেন, মাসীর কাছে এলাম। মাসীমাও চলে গেলেন! এবার আর কার কাছে যাব?"

—বলিতে বলিতে অনুপ্রভা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরস্বতী দেবীর মনে হইল অশোকের বিবাহের সম্বন্ধের সহিত এই যাওয়ার বোধ হয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার মনে হইল যদি এই নম্র কার্য্যকুশল শান্ত সুন্দর বাপ মা হারা মেয়েটিকে ছেলেটির জন্য গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে আজ তাঁহার আর কোন ক্ষোভ রহিত না। আগে এ ব্যাপার হইলে তিনি স্বামীকে বলিয়া এবিষয়ে তাঁহার মত করাইতে পারিতেন, কিন্তু স্বামীর বন্ধু ও পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা মাঝখানে আসিয়া পড়াতে স ভরসা ত আর নাই।

অনুপ্রভাকে কোলের কাছে টানিয়া অতি স্নেহভরে গৃহিণী কহিলেন, কেন মা আমাকে পর ভাবছ? আমার কাছে থাক মা। আমার তো মেয়ে নেই, তোমায় আমি মেয়ের মত করে রাখব।"

ইহার উত্তরে সে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া কহিল, "না মা আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এসময়ে একবার সেখানে পাঠিয়ে দিন।"

সরস্বতী আর কিছু কহিতে পারিলেন না। শুধু দুঃখে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রবিবারে অশোক বাড়ী ফিরিয়া যখন পিতার বন্ধুকন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা শুনিল, তখন তাহার মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনুপ্রভাকে সে যে বিবাহ করিবে এ সংকল্প সে তখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে বিবাহ না করিয়া অপর একজনকে বিবাহ করিতে হইবে ইহার জন্যও অশোক প্রস্তুত ছিল না।

অনুপ্রভা একথা শুনিয়া কি ভাবিয়াছে ইহাও সে একবার ভাবিল। কিন্তু অনুপ্রভাকে বা বাড়ীর আর কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অপরাহ্ণে অতুলকৃষ্ণ অশোককে ডাকিয়া বলিলেন, "মেয়েটি একবার তার কাকাদের কাছে যাওয়ার জন্যে বড় ঝুঁকেছে। বড় শোক পেয়েছে, একবার আপনার লোকদের কাছে গেলে মন কিছু ভাল হবে। কাল সকালের ট্রেণে তুমি ওকে গয়ায় রেখে, আবার কলিকাতায় ফিরো। সোমবারে বাড়ী আসবে, বিশেষ দরকার। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু গিরিশ তোমাকে ঐদিন আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

অনুপ্রভা আপনা হইতে সেই কাকাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছে, যেখানে যাইবার জন্য কয়দিন আগেও তাহার কোন আ[illegible]ণ ছিল না, ইহাতে অশোক অনুপ্রভার হৃদয়ের খানিকটা অংশ যেন দেখিতে পাইল। খুড়ীমার মৃত্যুশয্যায় সেই কথাগুলি যে বালিকা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝা গেল।

সন্ধ্যাকালে পিতা বহির্ব্বাটীতে এবং মাতা গৃহকর্ম্মে যাইলে অশোক অনুপ্রভাকে একাকী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অনু তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে?" অনুপ্রভা মুখ না তুলিয়াই মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

অশোক পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তবে কেন এখান থেকে চলে যেতে চাচ্চ ?"

ইহার উত্তরে অনুপ্রভা সহসা কিছু বলিতে পারিল না।

অশোক তখন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল তাহলে, কেন চলে যাবে ?"

অনুপ্রভা ধীরে ধীরে বলিল, "এখন ত কাকারাই আমার অভিভাবক। নইলে আর কোথায় যাব ? এখন না গেলে শেষে তাঁরা আরও অসন্তুষ্ট হবেন।"

অনুপ্রভার আর থাকিবার স্থান নাই তাই সে চলিয়া যাইতেছে, এ কথাটা অশোকের মনে বড়ই আঘাত করিল। একটু কাতর হইয়া বলিল, "আমাদের এখানে কেন থাকবে না ? আমরা যে কত আনন্দে তোমার ভার নিয়েছি।"

একটা ক্রন্দনের বেগ অতি কষ্টে দমন করিয়া অনুপ্রভা কহিল, "আপনার যে আমার ভার নেবার আর সুবিধে হবে না। আপনার পায়ে পড়ি আমার ভারের জন্যে আপনি আর ভাববেন না। আমায় শুধু দয়া করে সেখানে একটিবার পৌঁছে দিন।"

—বলিয়া আর সে আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মুখে আঁচল দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

অশোক তাহাকে আর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে সেই রাত্রের কথাগুলি এমন দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহা তো অশোক কল্পনা করিতে পারে নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাত্রে অশোক মাকে সকলের অসাক্ষাতে যোগমায়ার মৃত্যুশয্যাসংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া, এখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য এবং তাহার পিতা সে কথা জানিতে পারিলে কি ভাবিবেন

ইত্যাদি সমস্ত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ইহাতে তাহার নিজের কতখানি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তাহা কিছুই না বলিয়া শুধু মায়ের কাছে কোনও একটা উপায় শুনিবার জন্ম চাহিয়া রহিল। কিন্তু প্রিয় পুত্রের কাতর ও সলজ্জ মুখের পানে চাহিয়া তাহার অকথিত বাণী মা ার অগোচর রহিল না। তাহাকে একটা মুখের কথায় ভরসা দিবারও উপায় না পাইয়া মায়ের প্রাণ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। সস্নেহে পুত্রের বিষণ্ণ মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "দিন কতক আগে কেন বলিসনি বাবা? এখন যে উনি বন্ধুকে একরকম কথাই দিয়েছেন।

নিতান্ত হতাশ হইয়া পুত্র কহিল, "তবে মা কোন উপায় নেই? তুমি বল্লেও হবে না?"

পুত্রের সেই হতাশার স্বর তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের মত মায়ের বুকে বিঁধিল। কষ্টে তিনি বলিলেন, "তিনি যে কথা দেন তা তো কিছুতে নড়চড় করেন না তাতো জানিস বাবা! আর তুই যে কথা বলেছিলি তা তো ভেবে বলিসনি—তোর পাপ হবে না। তুই বলেছিলি যে তুই ভার নিবি, তা সে তো তোর হয়ে আমরা নিতে বাধ্য রয়েছি। আপনার মেয়ের মত যত্নে আমরা মেয়েটিকে পাত্রস্থ করবো।"

"কিন্তু ও যে প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছিল। আমি ত খুড়িমাকে ঐ রকম বুঝতে অবসর দিয়েছিলাম।"

অশোক নিজের প্রকৃত মনের কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মা বলিলেন, "তুই যে শরতের মাকে সব কথা পরিষ্কার করে বল্‌তে পারিস্‌নি, সে তো তিনি পাছে বেশী দুঃখ পান এই বলে। মেয়েটি যখন যেতে চাইছে, তখন তুই এক মাসের জন্তে ওকে কাকাদের কাছে রেখে আয়। তারা তেমন ভাল লোক নয় শুনেছি। তা হ'ক, তাঁদের তুই বলে আয় যে মেয়েটির দরুণ মাসে দশ টাকা করে পাঠাবি, আর

বিয়ের সব খরচ তাও করবি। তাঁরা যেন এঁকে ভার মনে না করেন। তাহলে বোধ হয় এর কোন অসুবিধা হবে না। তার পর একমাস পর কায মিটলে মেয়েটিকে নিয়ে এসে সৎপাত্রে দিস্, তা হলেই হবে। মেয়েটি সৎপাত্রে পড়ে সুখী হোক, তোরও যেন মনে তার জন্যে কোন আপশোষ না থাকে।"

মায়ের কথার ভিতর এমন একটি স্নেহ ও কর্ত্তব্য মিলনের ইঙ্গিত ছিল যাহা বুঝিয়া পুত্রের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। ভক্তিভরে মার পায়ে মাথা রাখিয়া অশোক বলিল, "মা তোমার কথামত যেন আমি চলতে পারি। আমার জন্যে কেউ যেন কোন কষ্ট না পান।"

কত কথা কত আশঙ্কাই আজ তাহার মনে উদয় হইতেছিল। আর বেশী কিছু না বলিয়া, সে পরদিন প্রভাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

অশোকের পত্র

আজ সন্ধ্যাকালে অশোকের আশীর্ব্বাদ হইবে। গিরিশবাবু বিকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিবেন। আহারাদির একটু ভাল রকমই ব্যবস্থা হইবে। পুরোহিত ও গ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জনকয়েককেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

সরস্বতী সকাল হইতেই তাহার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কি রকম একটা অশুভ ভাবনা আসিতেছে, চেষ্টা করিয়া মন হইতে তাহাকে তাড়াইতে হইতেছে। একমাত্র পুত্রের বিবাহ হইবে—কেন যে সূচনাতেই এই একটা অচিন্তিত অশান্তি আসিয়া জুটিল ইহা ভাবিয়া তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সকাল সকাল পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিবেন, এমন সময় অতুলকৃষ্ণ একখানি চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীর সদানন্দ মুখে অমন অসন্তোষের চিহ্ন, বিশেষ কা[illegible] না ঘটিলে দেখা যাইত না। আজ তাহা দেখিয়া সরস্বতীর মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

নিকটে আসিয়া অতুলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক এবার যাবার সময় তোমাকে কিছু বলে গিয়েছিল?"

সরস্বতী শীঘ্র কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না।

সরস্বতীকে উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ

অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "তাহলে তোমাকে সে আগেই কিছু বলেছিল। সে কথা তোমার বলা উচিত ছিল।"

সরস্বতী একটু উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, কি হয়েছে সে জন্যে ?"

"পড়ে' দেখ" বলিয়া অতুলকৃষ্ণ হাতের চিঠি রোয়াকের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই সামান্য কার্য্যটায়, স্বামী যে কতখানি বিরক্ত হইয়াছেন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সরস্বতী সহজেই মনে আঘাত পান, সে জন্য অতুলকৃষ্ণ এমন কোন প্রকার ব্যবহার করিতেন না যাহাতে স্ত্রীর প্রতি অতি সামান্য বিরক্তি বা অসন্তোষও প্রকাশিত হয়। কিন্তু আজ তিনি কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেও স্বামী পত্রখানি রোয়াকে ফেলিয়া দিলেন, ইহাতে সরস্বতী অত্যন্ত আহত হইলেও একটা ভীষণ আশঙ্কার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। নীরবে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

অশোক প্রথমেই যোগমায়ার মৃত্যুশয্যায় সেই প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়াছে। আদর্শ চরিত্র ও স্নেহ-সুকোমল হৃদয়ের জন্য সে আজীবন যাঁহাকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, তিনি যে বিশ্বাস মনে লইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহার সেই বিশ্বাস ও আশার ব্যতিক্রম করিয়া অন্যত্র বিবাহ করা যে তাহার পক্ষে কত কঠিন, অথচ যাহাকে প্রত্যক্ষ দেবতার মত ভক্তি করিয়া আসিয়াছে সেই তাহার পিতৃদেবের ইচ্ছার প্রতিকূলে যাওয়া তাহার যে কত ক্লেশকর হইয়াছে তাহা লিখিয়াছে। তার পর লিখিয়াছে অনুপ্রভার কথা ; সেই পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটির দুঃখের কথা। পিতার আশ্রয় হারাইয়া তাহার মাতামহের মৃত্যুর পর তাহার মাতার উপর নির্ভর করা, তার পর সেই মাতার মৃত্যুর পর তাহার সেই

মাসীর অবস্থা ; ভগবান তাহাকে শেষে মাসীমার যে আশ্রয় দিয়াছিলেন অবশেষে তাহা হইতে তাহার বঞ্চিত হওয়া ; মাসীমার মৃত্যু-শয্যায় অশোকের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহার যে মনোভাব, তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে আসিয়া কি দুঃখে যে সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গেল এবং সর্ব্বশেষে যে সংসারে সে ফিরিয়া গেল সেখানে তাহার কি দুরবস্থা হইয়াছে এবং আরও হইতে পারিবে ইহার মোটামুটি একটা করুণ চিত্র শব্দের পর শব্দ দিয়া আঁকিয়া সে পিতার চোখের সম্মুখে ধরিয়াছে। পরিশেষে লিখিয়াছে যে এ অবস্থায় এখন অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং এই কথা এখন না বলিয়া আর দেরী করিয়া বলিলে আরও অনিষ্ট ও অনর্থ হইবে, তাই আজ বাড়ী না আসিয়া সে ভয়ে ভয়ে পিতাকে এই সংবাদ দিতে বাধ্য হইল।

উপসংহারে অশোক পিতার নিকট অনেক মিনতি করিয়াছে এবং লিখিয়াছে যে আজিকার এই অবাধ্যতা তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ অবাধ্যতা হইবে এবং যদি তাহার পিতা তাহাকে ক্ষমা করেন তাহা হইলে অবিলম্বে জীবন পিতৃসেবা ও বাধ্যতার দ্বারা পরিচালিত করিয়া অদ্যকার এই অন্যায় ও অবাধ্যতার সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

সরস্বতীর পত্রপাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অতুলকৃষ্ণ চুপ করিয়া ছিলেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী চিঠিখানি রাখিলেন।

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "গিরিশ আজ সন্ধ্যায় আসবে, আর সকালে এই পত্রখানা লিখে পাঠালে! সে এলে যে আমার মাথাকাটা যাবে! ছেলের উপর আমার এতটুকু অধিকারও নেই একথা জানা যাবার পর আমি তার মুখের পানে চাইব কি করে আমি শুধু তাই ভাবছি!"

স্বামী যে বন্ধুর কাছে কতখানি অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইবেন এবং তাঁহার পিতৃগর্ব্বে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে তাহা বুঝিলেও, পুত্রের পত্রের

মধ্যে কতখানি কাতরতা ও দুঃখ যে সঞ্চিত ছিল সেই কথাটিই তাঁহার বেশী করিয়া মনে হইতেছিল। ইহার পরে সে আরও কি করিয়া বসে এবং পিতাপুত্রের বিরোধ কোথায় গিয়া দাঁড়ায় ইহা ভাবিয়া তাঁহার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল।

সরস্বতী পুত্রকে পিতৃস্নেহে ও নিরাপদে গৃহে ফিরাইয়া আনার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "অশোক আমার যাহোক ছেলেমানুষ, ঝোঁকের বশে তোমাকে এই চিঠিখানা লিখে ফেলে হয়ত শেষে আপশোষ করছে! কল্‌কাতা তো বেশী দূর পথ নয়, তুমি চট করে একবার তার কাছে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তাতে তার লজ্জাও ভাঙ্গবে, আর তোমাকে দেখলে মনের ঝোঁকটাও কমে আসবে। তুমি তাই যাও।"

বলিয়া সরস্বতী অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ মুখে স্বামীর পানে চাহিলেন।

কথাটা অতুলকৃষ্ণের সঙ্গত বলিয়া মনে লাগিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে সজ্জিত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "গিরিশকে আমি টেলিগ্রাম করে আজ আসতে বারণ করছি। যদি দৈবাৎ সে আজ এসে পড়ে, তাকে বলো সে যেন আমার জন্যে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে।"

ডাকঘরে প্রথমে অতুলকৃষ্ণ গিরিশকে টেলিগ্রাম করিলেন—"অশোক অনুপস্থিত আশীর্ব্বাদ আজ স্থগিত রাখ। পরে সংবাদ দিতেছি!" ইহার পর ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন।

স্বামীর যাত্রার পর হইতে সরস্বতী দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, স্বামীর সহিত পুত্র যেন অবিলম্বে ফিরিয়া আসে। কিন্তু মনের ভিতর হইতে একটা যেন আশঙ্কার ঢেউ উঠিতে লাগিল। একটা দারুণ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অন্তরাত্মা বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যার ট্রেণে অতুলকৃষ্ণ একা বাড়ী ফিরিলেন। বাহির হইতে গিরিশ আসে নাই খবর পাইয়া একটু যেন আশ্বস্ত হইলেন।

বাড়ীর ভিতর তাঁহাকে একা প্রবেশ করিতে দেখিয়া সরস্বতী দেবী ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক এল না?"

গম্ভীর মুখে স্ত্রীর পানে চাহিয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "না। তার চাকরের মুখে শুনে এলাম সে তোমাদের সেই অনুপ্রভার কাছে ভাগলপুরে গিয়েছে।" অনুপ্রভা নামটা তিক্ত ঔষধ সেবনের মত করিয়া তিনি উচ্চারণ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয় সন্ধানে

অশোক যেদিন অনুপ্রভাকে নিজের গৃহ হইতে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, সেইদিন তাহার ভারাক্রান্ত দুঃখকাতর হৃদয়ের মধ্যে এই-টুকু সান্ত্বনা ছিল যে, অনুপ্রভা তাহারই সঙ্গে যাইতেছে আর কাহারও সঙ্গে নহে। সে জন্য যখন সোনার গাঁ ষ্টেশন হইতে উভয়ে গরুর গাড়ীতে উঠিয়াছিল, তাহাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও মনে পরস্পরের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার নিশ্চিন্ত আশঙ্কাটা তেমন করিয়া প্রবল হইতে পারে নাই। চৌবাড়িয়া গ্রামে যাইয়া খোঁজ করিয়া যখন বিরল বসতি গ্রামের মধ্যভাগে হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন বড় একটা ছিল না বলিলেই হয়। যাহারা ছিল তাহারা গ্রামান্তরের লোক। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া অশোক গাড়ী হইতে নামিয়া পথের নিকট দুই এক ঘর গৃহস্থের নিকট হইতে সন্ধান জানিয়া যথাস্থানে আসিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর অনুপ্রভার শোকাতুরা মাতা যেদিন অবজ্ঞা ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাকে লইয়া পিতার নিকট যাত্রা করিয়া-ছিলেন, সেদিনকার সেই আর এক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় তাহার চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিতেছিল। গাড়ী হইতে অনু-প্রভাকে নামাইয়া লইয়া অশোক বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া চাড়ুয্যে মশায় চাড়ুয্যে মশায় করিয়া ডাকিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রায় মাথায় করিবার উদ্যোগ করিবার পর, একটি বারো বছরের মেয়ে ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা? কে ডাকছ?"

অশোক এইবার একটু ভরসা পাইয়া বলিল, "আমরা হরধাম থেকে আসছি! আমার সঙ্গে হরেন বাবুর ভাইঝি অনুপ্রভা আছে।"

"অনু দিদি এসেছে? ওমা শীগ্‌গির ওঠ, অনুদিদি এসেছে" বলিয়া বালিকা সহর্ষে একেবারে দুয়ারের নিকট আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে কে একজন সরোষে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁলা ইন্দি, জিজ্ঞাসাবাদ নেই দরজা খুলে দিলি যে?"

ততক্ষণ বালিকা দূর হইতে অনুপ্রভার মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র একবার ডাকিল, "অনুদিদি ভাই" এবং অনুপ্রভার নিকট হইতে "ইন্দুভাই," বলিয়া উত্তর আসিতেই ছুটিয়া গিয়া সানন্দে অনুপ্রভার হাত ধরিল এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

সূচনায় এতখানি সস্নেহ অভ্যর্থনা শুনিয়া, অনুপ্রভা এখানে কত সুখে থাকিবে তাহার একটা কঠোর কল্পনা অশোকের মনকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল এবং নিজের জন্য ইহার চেয়ে অনেক কটু কথায় অভ্যর্থনার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল। মিনিট পনেরো দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিবার পর বাহিরের ঘরটা খুলিয়া সেই বারো বছরের মেয়েটি একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি আসুন, এই ঘরে এসে বসুন।"

অশোক দুয়ার খোলা পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। জুতাযোড়াটা খুলিয়া সম্মুখে যে চৌকিখানা ছিল তাহার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

শরীর ও মন দুইটাই অশোকের সত্যই তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খানিকটা সেই অবস্থায় শয়নের পর সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ঘণ্টা-খানেক পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নিম্নের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে সে নেত্রোন্মীলন করিল।

"হ্যাঁলা অনি, তা মাসীকে পেটে পুরে নিশ্চিন্দি হয়ে এখন বুঝি আমার

কাঁধে এলি? সে হবে না বাছা, ১৭ বছরের ধাড়ী আইবুড়ো মাগী রাখবার ক্ষেমতা আমার নেই। এসেছ, আপনার লোক, খাও দাও, রাত্তিরটা থাক। সকালে উঠে যার সঙ্গে এসেছ তার সঙ্গে ফিরে যাও।"

"হ্যাঁমা তোমার কি আক্কেল? কদ্দিন পরে অনুদি এল, আর ঐ রকম ঠোকর মারা কথা বলে তাকে কাঁদাতে থাক্‌লে!"

"তুই চুপ করে থাক্ ত ইন্দি! ছেলেমুখে বুড়ো কথা আমি সইতে পারিনে। তুই আসিস্ আমাকে রীতনীত শেখাতে! তোর বাবা আমার কাছে রীতনীত শেখে তা জানিস্?"

"ছাই শেখেন তোমার কাছে। তোমার জিভের যে বিষ, তাই বাবা কিছু বলেন না।"

"আমার জিভে বিষ, তোর বাবার জিভে বুঝি মধুভরা? পোড়ারমুখো মিন্‌সে আমায় সাতকাল জ্বালিয়ে খেলে।"

"কেন তুমি বাবাকে মিছেমিছি গাল দেবে? বাবা তোমার কি করেছেন?"

তার পর কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ক্রন্দনের শব্দে প্রথম উত্থাপিত প্রশ্নটি হারাইয়া গেল।

কি আরামে অনুপ্রভা এখানে থাকিবে অশোক তাহা মনে মনে বেশ ভাল রকমই কল্পনা করিয়া লইতেছে, এমন সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অনুপ্রভা একটা রেকাবি হাতে লইয়া সেই ঘরের মধ্যে আসিল। অশোক চক্ষু মুদিয়া যেমন পড়িয়াছিল তেমনি রহিল। অশোক আগেকার লজ্জাজনক কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া অনুপ্রভা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

অশোক ইচ্ছা করিয়া নিদ্রার ভান করিয়াছিল, তাই গোটা দুই ডাক শুনিবার পর সে সাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। অনুপ্রভা রেকাবীতে করিয়া যে

খাবার আনিয়াছিল তাহা লজ্জিত মুখে রাখিয়া বলিল, "বারান্দায় পা ধোবার জল রেখেছি। হাত পা ধুয়ে এই মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে একটু জল খাও।"

অনুপ্রভার লজ্জার কারণ যে তাহার আনীত জলখাবারের মধ্যে জল পুরাপুরি এক গেলাস থাকিলেও, খাদ্য দ্রব্যটকু ছোট পাত্রখানির দশ-মাংশের একাংশ মাত্র পূর্ণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। আর ৭।৮ ঘণ্টা খাদ্যাভাবের পর সামান্য একটু নারকেল কোরা ও দুখানি বাতাসা!

অশোক হাত মুখ ধুইয়া সেই খাদ্যটুকুর কণামাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া উদরস্থ করিল এবং পরিপূর্ণ একপাত্র জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তাহার পর পকেট হইতে রুমাল খানি বাহির করিয়া হাত মুখ মুছিয়া অনু-প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাকাকে ত দেখলাম না। তিনি কোথায়?"

অনুপ্রভা নতমুখে বলিল, "তিনি একটু রাতে প্রায় ১২টায় ফেরেন।"

"অত রাত্রে!" বলিয়া একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অশোক চুপ করিল।

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার ত বড্ড কষ্ট হবে। কাকা এলে তবে রান্না চড়ান হবে।"

কথাটা বিলক্ষণ নূতন বটে। কিন্তু সেদিকটা বিশেষ লক্ষ না করিয়া অশোক বলিল, "তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে আর এক [illegible]থে যেতে যা কষ্ট হচ্ছে, তার চেয়ে এতে ঢের কম কষ্ট হবে অনু! সে কষ্টটা যখন তুমি দেখলে না, এর জন্য আর দুঃখ করা কেন?"

অনুপ্রভা একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনাকে সম্বরণ করিতে লাগিল। তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—আমি ত তোমার কাছে চিরদিন থাকব বলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ভগবান থাকতে দিলেন না তাতে আমি কি করবো!

একটু পরে অনুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাল কখন যাবেন তা হলে ?"

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, "কাল সকালে একটা ট্রেণ আছে কলকাতায় যাবার, তাতেই যাবো।"

এমন সময় খুব রুক্ষস্বরে ভিতর হইতে শুনা গেল—"সকালে খেতে দিতে হয় অনিকে ডাক্। ডেকে ভাত বাড়্তে বল। ধেড়ে মাগীর বুঝি এখন ছোঁড়াটার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া হয়েছে।"

অনুপ্রভার মুখ হইতে কাণ পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল এবং লজ্জা ঢাকিবার জন্য সে অশোকের পানে চোখ না তুলিয়াই মুখ নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অশোক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সত্য সত্যই রাত্রি ১২টার সময়ে অনুপ্রভার কাকা ইন্দু বলিয়া ডাক দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

তিনি আসিবার পর আহারাদি হইল, তাহাতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল।

শয়নের পূর্ব্বে হরেন্দ্র যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আজকাল দিনকাল বড়ই খারাপ পড়িয়াছে এবং সেই জন্য দিন দিন পিতাও কন্যাকে মানুষ করিতে কাতর হইয়া পড়িতেছেন, এবং মানুষ করা ব্যাপারটা তবু কতকটা চেষ্টা করিলে সম্ভব ; কিন্তু, কন্যার বিবাহ দেওয়া ব্যাপারটী একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

তখন অশোক অনুপ্রভার ভার তাঁহাদের কতখানি লইতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিল।

হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রায় সকলেরই বেলাতে উঠা অভ্যাস কারণ রাত্রি ১টার সময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে উঠিতে একটু বিলম্ব

হওয়াই স্বাভাবিক। সকালে উঠিয়া আগেই অনুপ্রভা আসিয়া অশোকের সম্মুখে ধীরে ধীরে দাঁড়াইতেই অশোকের চিত্ত বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। অশোক চাহিয়া দেখিল অনুপ্রভার মুখ চোখ ঈষৎ স্ফীত ও জলসিক্ত।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখবিসুখ হয়েছে অনু ?"

অনুপ্রভা অতি কাতরকণ্ঠে উত্তর দিল, "না।" তার পর দুজনেই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অশোক প্রথমে কথা কহিল—"আমাকে কলকাতার ঠিকানায় পত্র দিও। কোন অসুবিধা হবামাত্র আমাকে জানিও। বল জানাবে ?"

অনুপ্রভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে জানাইবে। তখন তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল।

অশোকের চক্ষু সিক্ত হইয়াছিল। একবার মনে হইল সে অনুপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করে কেন বা সে তাহাদের বাড়ী হইতে এমন নির্ম্মমভাবে চলিয়া আসিল। আবার ভাবিল, যদি এখনও অনুপ্রভা যাইতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে এখনও সে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার এখানে অনুপ্রভাকে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। কিন্তু যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত তাহার উৎকণ্ঠা ও মনোভাব স্রোতের টানের মত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বলিতে লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। তাহার পরিবর্ত্তে অশোক বলিল, "তোমার যখনই যাবার ইচ্ছা হবে আমাকে লিখো, আমি তখনি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব।"

অনুপ্রভা আপনাকে আর দমন করিতে না পারিয়া, উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে মুখে অঞ্চল প্রান্ত দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

ইহার খানিক পরে হরেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন। অশোক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে অনুপ্রভার জন্ত মাসিক খরচ সে নিয়মিতভাবে

পাঠাইবে এবং অনুপ্রভার বিবাহের জন্ম তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, অনুপ্রভা যাহাতে সৎপাত্রে পড়ে তাহার জন্ম বিশেষ ব্যবস্থা তাহার মা করিবেন এবং দরকার হইলে সে সুপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিবে।

ইহার কিছু পরে অন্যের অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া অশোক সেস্থান ত্যাগ করিল। অনুপ্রভা তখন বাড়ীর ভিতর একা একটা ভাঙ্গা ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন ভাব

কলিকাতায় ফিরিবার পথে অনুপ্রভার অশ্রুসিক্ত মুখখানি অশোকের মনে সকণ্টক ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া সেখানটিকে সুরভিত ও রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহার দুটি চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল এবং প্রিয়জনের অন্তর কাঁদিলে আপনার অন্তরে যে ক্রন্দন প্রতিধ্বনির মত জাগিয়া উঠে, সেইরূপ একটা অতি করুণ ক্রন্দন তাহার অন্তরের মধ্যে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। সে এই প্রথম স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, যে সে অনুপ্রভাকে নিজেই গ্রহণ করিতে যাইতেছিল সে শুধু খুড়িমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নহে। অনেকখানি প্রাণের টানও ইহার মধ্যে ছিল এবং সে টানটা যে কতখানি তাহা অনুপ্রভাকে ছাড়িয়া আসিয়া যেমন ভাবে অনুভব করিল এমন ভাবে আর কোনদিন করে নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত কায সমস্ত চিন্তার মধ্যে অনুপ্রভার চিন্তা অচল ও অটল হইয়া রহিল। যে খুড়িমার স্নেহনীড়ের মধ্যে সে আশ্রয় লইতে গিয়াছে, তাঁহার স্নেহহীন কঠোর স্বর তো সে বেশ করিয়াই শুনিয়া আসিয়াছে। পিতৃমাতৃহীনা শেষ-আশ্রয়চ্যুতা অভাগিনী নারীর সেখানে তো কোন সান্ত্বনা মিলিবে না। কোথায় সে যাইবে, কাহার পানে সে ভরসার জন্য চাহিবে? সেই স্নেহহীন নীড়ের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবে, তখন তাহার ভারাক্রান্ত

হৃদয় কাহারও সস্নেহ কথায় তো লঘু হইয়া উঠিবে না—কাহারও মুখের হাসির আলোকরেখায় আঁধার হৃদয়ে দীপ জ্বলিবে না।

আজ অশোকের বেশী করিয়া মনে হইল যে সে তো অনুপ্রভাকে সেখানে রাখিবার জন্য তেমন করিয়া চেষ্টা করে নাই। সে যদি অনুপ্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিংবা অন্ততঃ তাহার বিবাহের সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি বা অনিচ্ছা পোষণ করিত, তাহা হইলে হয়ত অনুপ্রভা আসিতে চাহিত না। কিন্তু পিতার প্রতিকূলে দাঁড়ানও যে তাহার পক্ষে এখন অকর্ত্তব্য হইত। ভগবান্ তাহার শান্তিময় জীবনে এ কি অশান্তির ঢেউ সৃষ্টি করিলেন!

কিন্তু আজ অশোক ভাল করিয়া অনুভব করিল, তাহার পক্ষে এখন অনুপ্রভা ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করা সম্ভব নহে।

অনুপ্রভা তাহাকে ভালবাসে এবং তাহাকে পাইবে না এই অভিমানে সে অনেক দুঃখ সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল, এই অনুভূতি, এবং পরিশেষে অনুপ্রভার অদর্শন তাহার অনুরাগকে প্রণয়ে সমৃদ্ধ ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

দুই দিন পরে অশোক পিতাকে সমস্ত বুঝাইয়া পত্র লিখিল এবং আপনি গিয়া ডাকে দিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি সে তাহার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ও অনুপ্রভার প্রতি কর্ত্তব্য এ দুইয়ের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য-বিধান করিতে না পারিয়া, সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় কাটাইল। রাত্রের অন্ধকারের মোহময়তা কাটিয়া গিয়া যখন প্রভাতের সত্যকার স্পর্শ ও আলোক জাগিয়া উঠিল, তখন অশোক ভাবিল পিতার নিকট এতক্ষণ সে পত্র পৌঁছিয়াছে এবং তিনি সে পত্র পাইয়া কি ভাবিতেছেন! তাঁহার বন্ধুর নিকট কতখানি লজ্জিত ও অপদস্থ হইতেছেন তাহা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। একবার মনে করিল বুঝি সে পত্রখানা

না লিখিলেই ভাল হইত। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তীর ও কথিত বাক্যের মত, প্রেরিত পত্রকেও তো আর ফিরাইবার উপায় নাই।

অশোক আরও ভাবিয়া দেখিল যে হয় পিতৃনির্ব্বাচিতা পাত্রীকে বিবাহ করা, না হয় তাহাতে অস্বীকৃত হওয়া এ দুটির মাঝামাঝি তো আর পথ ছিল না।

অশোক এই সব দুশ্চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় পিওন আসিয়া দুইখানা খামের পত্র দিয়া গেল। একখানিতে অনুপ্রভার হাতের লেখা। তাহার লেখা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া অশোক পড়িল—

শ্রীচরণেষু—

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আপনি দয়া করিয়া না আসিলে আমার আর উপায় নাই।

হতভাগিনী অনুপ্রভা।

অপর পত্রখানি হরেন্দ্র বাবুর লেখা। তিনি লিখিয়াছেন—

আশীর্ব্বাদরাশয়সন্তু

পরে অশোক ঈশ্বরের স্থানে নিয়ত তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছি। তুমি যাইবার পরে আর কোন সংবাদ না পাইয়া ভাবিত আছি।

অনুপ্রভা এখানে পিতামাতার কাছেই আছে মনে করিও। তাহার জন্য চিন্তা করিও না ও তোমার পিতামাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিও। সম্প্রতি তাহার জন্য একটি সুযোগ্য পাত্র অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছি। কারণ অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ঘরে রাখিয়া আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ ঘরের মেয়ে তাহাকে অন্যত্র দিবার উপায় নাই। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় পাত্রীর তুলনায় পাত্র মিলিয়াছে খুবই ভাল। এখন বিবাহটা হইয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাত্রের বয়স এখনও ৪০ হয় নাই, স্বাস্থ্য ভাল। বংশও উত্তম। আহারের সংস্থান বিলক্ষণই আছে।

পাত্রটিকে অল্পেই স্বীকৃত করানো গিয়াছে। পাত্রপক্ষকে দিতে হইবে দুই হাজার টাকা, আর এখানকার খরচ সকল সঙ্ক্ষেপেই করা হইবে। পাঁচ-শত টাকা হইলেই চলিবে।

সর্ব্বসমেত এই আড়াই হাজার টাকার তুমি ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইবে। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে যে টাকার জন্য আটকাইবে না। কিন্তু তা বলিয়া কি একেবারে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারি? বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি আগামী বৃহস্পতিবার। তোমার এখন পড়িবার সময়, সেজন্য তোমাকে পুনরায় আসিতে অনুরোধ করি না, তবে যদি আস বড়ই সুখী হইব। না আসিতে পারিলে ব্যস্ত হইও না, আমি সব যোগাড় করিয়া লইব। তবে তুমি টাকাটা পত্রপাঠ পাঠাইবে, নহিলে কার্য্যের কোন যোগাযোগ হইবে না। টেলিগ্রাফে নাকি টাকা পাঠানো যায় শুনিয়াছি, তাহাই পাঠাও। তাহা হইলে দেরী হইবে না। এখানকার কুশল জানিও, তোমাদের কুশল দিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ (চট্টোপাধ্যায়)

এই পত্র পাইয়া, সকালের ট্রেণেই অশোক চৌবেড়িয়া যাত্রা করিয়াছিল। এবং অতুলকৃষ্ণ সেইদিনই অপরাহ্নের ট্রেণে কলিকাতায় আসিয়া, পুত্রের চৌবেড়িয়া যাত্রার কথা বাসার ঝি ও বামুনের নিকট জানিয়া গিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রৌঢ়ের মনস্তত্ত্ব

অতুলকৃষ্ণ পরদিন অপরাহ্ণে কোন সংবাদ না দিয়াই সোদপুর ষ্টেশনে নামিয়া একেবারে পাণিহাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গিরিশ ব্যস্তভাবে আসিয়া বন্ধুকে হাতে ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি অতুল? এ যে মেঘ না চাইতেই জল!"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কথাটা তোমাকে বল্‌তে এলাম, তা বল্‌তে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তখন খুব দর্প করেই বলেছিলাম যে তোমার ও আমার দুজনের যখন মত, তখন বিবাহ তো হয়েই গিয়াছে। কিন্তু দর্পহারী তো কারুর দর্প কখনও রাখেন না, তাই আমার সে দর্প সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়েছে।"

বলিয়া অতুলকৃষ্ণ গভীর ক্ষোভের সহিত, আশীর্ব্বাদে সেদিন কেন বাধা ঘটিল সে সব কথা সবিস্তারে বন্ধুকে বলিলেন।

অতুলকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, মুখভাব ও ভাষাতে তাঁহার অন্ত[illegible] লজ্জা ও মনোভঙ্গ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ গিরিশ, সমস্ত ছোট বড় কাজের মধ্যে প্রায় সবটাই যে ভগবানের হাত, আমার সেই ছেলেবেলাকার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্চে। এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কোনও আশঙ্কাও কখনও মনে হয় নি। নইলে কে ভেবেছিল যে অশোক শেষটা আমাকে লিখ্‌বে যে আপাততঃ ঐখানে বিবাহ তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং সে প্রকারান্তরে অমুক দুর্ভাগা মেয়েকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞা

করেছে। তুমি তো বরাবরই নিজের চেষ্টার খুব প্রশংসা করে আসছ। কিন্তু বল দেখি এ ক্ষেত্রে কোন খানটায় আমি নিজে চেষ্টা করি ?"

গিরিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় এখন সব চেয়ে ভাল চেষ্টা হবে, বিশেষ কোন চেষ্টা না করা। দিনকতক ধীরভাবে অপেক্ষা করে দেখতে হবে, তার মনের গতি আপনা থেকে পরিবর্ত্তিত হয় কি না। কোনরূপে বাধ্য করার চেষ্টাতে তার সঙ্কোচ আরো বেড়ে যাবে। আমাদের দুজনেরই এটা ভাল মনে হচ্চে না যে এতদিনকার একটা পোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যাচ্ছে। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে এটা বলতেই হবে যে, এতে তার খুব দোষ নেই দুটি কারণে—প্রথম তাকে কোনদিনই তৈরি করে রাখনি ; দ্বিতীয় সে তো একটা মানুষ, একটা কল তো নয় যে তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে না। এক্ষেত্রে তার কথায় তোমার অত বেশী ক্ষোভ করা উচিত হবে না।"

অতুলকৃষ্ণের ক্ষোভ কিন্তু দূর হইল না। একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার কথাটা একটু বেশী দার্শনিক গোছের হয়ে পড়ল। বুকের সমস্ত স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করলাম, তার উপর কত আশা ভরসা রাখলাম, একটা সামান্য ঘটনায় সে বিপরীত পথে চলে গেল— এটা আমি কোন মতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারিনে।"

তারপর দুইজনে অনেক কথাই হইল। গিরিশের কন্যার নাম সতী। সে পিতার আজ্ঞায় আসিয়া অতুলকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। অতুলকৃষ্ণ মুগ্ধচিত্তে দেখিলেন মেয়েটির মুখখানি একেবারে দেবীপ্রতিমার মত। তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার কার্য্যকুশলতা, তাহার লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া অতুলকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ আরও বাড়িল যে এমন মেয়েটিকে তিনি পুত্রবধূ করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পর জলযোগান্তে দুইজনে মিলিয়া গঙ্গার ঘাটেই গিয়া বসিলেন। সেদিন শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। জ্যোৎস্নায় গঙ্গাবক্ষ, তটভূমি, নিকটস্থ শিবমন্দির সকলই যেন জলে পদ্মের মত শোভা পাইতেছিল।

গিরিশ বলিলেন, "দেখ অতুল, সময়ের সঙ্গে অবস্থার কি পরিবর্ত্তনই হয়ে যায়। আজ যদি আমরা আগেকার মত দুজনে গলা ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে এখানে বেড়াই, লোকে কি বল্‌বে জান?"

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "পাগল।"

গিরিশ বলিলেন, "পাগল বল্‌বে, কেন না আমাদের বয়স হয়েছে। অথচ দেখ, মনের মধ্যেটা তো প্রায় তেমনই নবীন আছে। জ্যোৎস্নায় বেড়াতে প্রাণের মধ্যে এখনও তো এই গঙ্গার ঢেউয়ের মত ঢেউ খেলে যায়। পুরাণো বন্ধু দেখ্‌লে এখনও মনে হয় যে তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করি। কিন্তু তা করতে দেখলে লোকে বল্‌বে দেখ, বুড়োর একবার কাণ্ডখানা দেখ! অতীতযৌবনেরা যে যুবকের মত আনন্দ করবে তা যুবকেরা কিছুতেই পছন্দ করবে না। তারা ভাবে আমরা যৌবনের রাজ্য পার হয়ে এসেছি, আর তার দিকে আমাদিগের যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা!"

তারপর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, আরও গল্পে ও নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

ইহার পরদিনও অতুলকৃষ্ণকে সেখানে থাকিতে হইল। নানা আনন্দের মধ্যে দুইটি প্রৌঢ় বন্ধুর দুটি দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে লকৃষ্ণ বিদায় লইলেন।

গিরিশ বলিয়া দিলেন, "যদি বিবাহ না হয়, তাহলে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না, বা রাগ কোরো না। আমাদের যে সম্বন্ধটি আছে সেটা তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি আজও কলকাতা হয়ে বাড়ী ফির্‌বো।

যদি নেহাত অদৃষ্টক্রমে নিজের ছেলের বিবাহে নিজের কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তোমার এই মেয়েটার বিবাহের ভার আমার উপর দিতে হবে। আমি আমার পছন্দমত পাত্রে এর বিবাহ দেবো।"

সেই দিনই অতুলকৃষ্ণ কলিকাতা হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। অশোক তখনও ফিরে নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরমা

পথে গরুগুলি রৌদ্রে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহাদের বৃক্ষতলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার পর অশোক যখন চৌবেড়িয়ায় পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ডাক দিবার পরও যখন অশোক তাহাদের কোনও সাড়াশব্দ পাইল না, তখন তাহার মনে সত্যই একটু আশঙ্কা হইল। একবার ভাবিল, তবে কি সে বাড়ী ভুল করিয়াছে? কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলা যায়? এটা কাহারও না কাহারও বাড়ী বটে ত! অন্য কাহারও বাড়ী হইলে অন্ততঃ তাহারা তো বলিতে পারিত যে এ হরেন্দ্র বাবুর বাড়ী নয়। তবে এটা যদি পোড়ো বাড়ী হয় সে স্বতন্ত্র কথা। আর যদি হরেন্দ্র বাবুর বাড়ী সত্যই হয় এবং সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এমনই হইয়া থাকে? ইঁহারা ঘুমাইতে পারেন, কিন্তু অনুপ্রভা তো ঘুমাইবে না।

বাড়ীর দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া ভাবিতেছে কোথায় ইহাদের খোঁজ করিবে, এমন সময় অশোক দেখিল রাস্তার ধারে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের পার্শ্বে কে একজন হাত বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত অশোক অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি কিশোরী মূর্ত্তি। "তুমি কে?" জিজ্ঞাসা করিতেই মেয়েটি বলিল,

"আমি ইন্দু, অনুদি'র বোন্। আপনি অনুদি'কে ডাকলেন কি না তাই আমি এসেছি।"

মেয়েটির দিকে আরও খানিকটা সরিয়া গিয়া অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "অনুপ্রভা কোথায়? তোমরা কোনও উত্তর দিলে না কেন?"

ইন্দু চুপি চুপি বলিল; "অনুদি' লুকিয়ে আছে। নইলে কাল রাত্তিরে যে জমিদার মুখপোড়া দিদিকে বিয়ে করে ফেল্‌বে।"

অশোক অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া ইন্দুপ্রভার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "তাহলে সে কোথায় আছে এখন?"

ইন্দু বলিল, "আমি আপনাকে যে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এই রাস্তাটা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁদিকে এক বাগানের মধ্যে চালাঘর দেখতে পাবেন। সেইখানেই দাঁড়াবেন। আমি বাগানের মধ্যে দিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে সেখানে যাচ্ছি। কাউকে যেন কিছু বল্‌বেন না—ঐ কে একটা মিন্‌সে আসছে—আপনি যান, আমি পালাই।" বলিয়া নিমেষ না ফেলিতে ইন্দুপ্রভা সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে হইতে অদৃশ্য হইল। অশোক সেদিক হইতে সরিয়া আসিয়া নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইল।

যাহাকে দেখিয়া ইন্দু পলাইয়াছিল সে লোকটা ক্রমে ক্রমে অশোককে অতিক্রম করিয়া গেল। লোকটা কুটুম্ববাড়ী যাত্রী একজন কৃষক। সে ব্যক্তি মেলায় কেনা লাল ছিটের একটা কামিজ কাঁধে ফেলিয়া, কালো বুরুষের জুতা জোড়াটা সাবধানে হাতে লইয়া পথ চলিয়াছে। তাহার ভরসা আছে, কুটুম্ব বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া একটা পুকুরে হাত পা ধুইবে এবং জুতা জামা পরিয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবে, তখন তাহার খরচ করিয়া জুতা জামা কেনা সার্থক হইবে।

মিনিট ৭।৮ এর মধ্যে অশোক ইন্দুপ্রভার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীখানার কাছে পৌঁছিয়া দেখিল, বাগানের মধ্যে ইন্দুপ্রভা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া

আছে। অশোক কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "আপনি বরাবর বাড়ীর ভেতর চলে যান, আমি ঠাকুরমাকে সব বলে এসেছি। তিনি বড় ভাল লোক।"

অশোক গমনোদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আস্‌বে না ?"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "উহুঁ—আমার দেরী হলে যদি কেউ জেনে ফেলে !"

তারপর যাইতে যাইতে ফিরিয়া চাহিয়া ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "অশোকদা, অনুদি'কে কিন্তু আজ যে করতে হবে। যেন 'না' বল্‌বেন না। অনুদি' আপনার জন্যে কেবল কাঁদে, অনুদি' আপনাকে খুব ভালবাসে।" বলিয়া ইন্দু সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

একটা খুব গুরুতর কাণ্ডের আভাস পাইয়া, অথচ তাহার সমস্তটা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হৃদয়ে অশোক সম্মুখের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই এক বর্ষীয়সী মহিলা 'এস, দাদা এস' বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন।

রমণীর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। অশোকের মনে হইল যেন এইমাত্র তিনি আহ্নিক সমাধা করিয়া উঠিয়াছেন। অশোক বুঝিল ইনিই বোধ হয় ইন্দুপ্রভার উল্লিখিত ঠাকুরমা। ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মনের সুখে থাক ভাই।"

এই ঠাকুরমা অনুপ্রভার বাপের খুড়িমা, একটু দূর সম্পর্ক। উপযুক্ত যুবক পুত্রকে হারাইয়া, বালক পৌত্রকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আপনার রুচিমত গড়িতেছেন। সে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়ে। সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছে।

ঠাকুরমা অশোকের রৌদ্রক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা গরমে বড্ড কষ্ট হয়েছে। জুতো জামা খুলে ফেল। হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিক করে কিছু খাও ভাই। সেই কখন্ খেয়ে বেরিয়েছ!"

অশোক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তেমন কষ্ট তো হয় নি।"

"হয়েছে বৈ কি ভাই। আমি তোমারও ঠাকুরমা হই। লজ্জা কোরো না।"

বলিয়া ঠাকুরমা ঘরের ভিতর জুতা জামা ইত্যাদি রাখিতে দেখাইয়া দিলেন।

অশোক জুতাজামা খুলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া লইয়া ঠাকুরমার দেওয়া একখানি কাচা কাপড় পরিয়া, হাসিয়া বলিল, "হাত মুখ ধোয়া আর খাওয়ার মাঝখানে যে কাযটীর কথা বল্লেন সেটা যে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।"

"তা হোক ভাই। অন্ততঃ মন স্থির করে' গায়ত্রীটা জপ করে নাও তো! কত সময় বাজেখরচে যাচ্চে, যার দৌলতে সব মিল্‌ছে তাঁকে কিছু দেবে না?" বলিয়া পিছন ঘরটিতে অশোকের জন্য আহ্নিকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অশোক আর কোন কথা না বলিয়া গায়ত্রী জপ করিতে বসিল। তাহার পর সে জলযোগ করিতে বসিলে ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমাকে এখন সব কথা বলি ভাই। এসে দেখে শুনে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছ।"

অশোক আগ্রহের সহিত ঠাকুরমার পানে চাহিল।

ঠাকুরমা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই।—গ্রামের এক প্রৌঢ় জমীদারের সঙ্গে অনুর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। সম্বন্ধ করিয়াছিলেন অবশ্য অনুর জ্যেঠামশায়। তবে তাহাতে জ্যেঠাইমারই বেশী কৃতিত্ব। কারণ

তাঁহারই পরামর্শমত এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। জমিদার বাবুর যত রকম দোষ থাকিতে পারে তাহা আছে। ভয়ঙ্কর মাতাল ও বদরাগী, স্বভাবও খারাপ। আগে দুই বিবাহ করিয়াছিল। গুজব এক স্ত্রীকে রাগের বশে মারিয়া ফেলে। আর একটী ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া নিস্কৃতি পায়। যে দিন অশোক অনুপ্রভাকে রাখিয়া যায় তাহার দুই দিন পরেই সম্বন্ধ স্থির হয়। জমিদারের নিকট দুই হাজার টাকা অনুর জ্যেঠাইমা হস্তগত করিয়াছে, উদ্দেশ্য ঐ টাকায় নিজের মেয়ের ভাল বিবাহ দিবে।

ইন্দু তাহার মা'র সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, কেন তিনি দুষ্ট লোকের সঙ্গে অনুদি'র বিবাহ দিতেছেন? ইন্দুর নিকট হইতেই ঠাকুরমা আজ এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। একেতো অশোক যাইবার পর হইতেই অনু কান্না আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উপর অন্য লোকের সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত তাহার চক্ষের জলের বিরাম ছিল না।

পাছে অনু কোনও গোলমাল করিয়া বসে এই আশঙ্কায় ইন্দুর মা তাড়াতাড়ি বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলেন। ইহার পূর্ব্বেই আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য অশোককে পত্র লেখা হইয়াছিল।

ইন্দু মেয়েটি বড় ভাল ও একটু অসাধারণ প্রকৃতির। কাহারও চোখের জল সে দেখিতে পারে না। বুদ্ধিও তাহার [illegible]। অনু অশোককে যে চিঠি লিখিয়াছিল সে নিজে তাহা ডাকে দিয়া, কি উপায়ে সে অনুদিদিকে রক্ষা করিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ঠাকুরমার কাছে আসে এবং তাঁহাকে বলে, অনুকে যতদিন অশোক না আসে ততদিন যেন লুকাইয়া রাখেন। ইন্দু মেয়েটিকে ঠাকুরমা বড়ই ভাল বাসেন, তাহার উপর অনুপ্রভার অবস্থা বুঝিয়া ও শুনিয়া তিনি কাল হইতে তাহাকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আজ বিবাহের দিন। আজিকার রাতটা

কাটিয়া না যাইলে ঠাকুরমার ভয় যাইতেছে না; কারণ জমিদার কাল হইতে আবার গ্রাম তোলপাড় করিতেছেন।

সমস্ত কথা ঠাকুরমা বলিয়া শেষে উপসংহার করিলেন, "এখন তুমি এসেছ ভাই, তোমার ভার তুমি নেও।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কি করলে সমস্ত বিপদ কেটে যায় আপনি বলুন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "জমীদার যে রকম ভয়ানক লোক, তাতে এখানে অনুকে বেশী দিন রাখ্তে সাহস হয় না, রাখা উচিতও নয়। তোমাকে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু নিয়ে যেতে হ'লে তোমাকে ওকে বিবাহ করতে হবে। নইলে এখান থেকে ওকে তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, নিরাপদও হবে না।"

অশোক চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। কোনও উত্তর করিল না।

ঠাকুরমা তাহাকে বলিলেন, "ওকে নিয়ে যেতে হ'লেই বিবাহ করা উচিত ও নিরাপদ কেন বল্‌ছি, তা শোন। অনুর যে রকম মনের অবস্থা, আর তোমার উপর ওর যে রকম মনের টান, তাতে তুমি যদি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, অথচ শেষে বিবাহ না কর, তাহলে ওর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমনি নিয়ে গেলে আরও এক বিপদ, জমিদার টের পেলেই তোমাদের পুলিস দিয়ে মিথ্যা যা হয় একটা কিছু বলে আট্‌কাবে। কিন্তু বিয়ে করে সেই অবস্থায় নিয়ে গেলে তার আটকাবার সাহস হবে না। তোমার কি মত এখন বল। যদি বিয়ে করা মত হয়, আজ রাত্রেই বিবাহ করতে হবে। আর অনুকে রক্ষা করতে হলে ও ছাড়া তো অন্য উপায় নেই।"

অশোক লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার তো কোন আপত্তি বা অনিচ্ছা নেই—তবে বাবা কি বল্‌বেন তাই ভাবছি।"

ঠাকুরমা চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তা ঠিক। তাতে আবার তিনি তাঁর বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছেন।"

অশোক আরও লজ্জিত হইয়া বলিল, "একে এখানে রেখে গিয়ে আমি কলকাতা থেকে তাঁকে এক পত্র লিখে দিয়েছি যে ওখানে বিবাহ করা অসম্ভব। কি যে তিনি ভেবেছেন তাও জানি নে।"

ঠাকুরমা। কিন্তু এখন তো তাঁর মত নিয়ে ঠিক করতে গেলে সময় থাকে না। মেয়েটার তাহলে দুর্গতির শেষ থাকবে না। হয় ত বাঁচবেই না। উপরি উপরি কত আঘাতই পেলে বাছা।"

অশোক। আমার অবস্থা আপনি সব বুঝেছেন, আপনিই বলুন কি করলে সব দিক রক্ষা হয়।

ঠাকুরমা একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, "আমি ভাই সে আগেই ঠিক করে রেখেছি। আমার মতে তুমি বিবাহ করে' কালই এখান থেকে কলকাতা রওনা হও। সেখানে গিয়ে সব কথা তাঁকে লিখে জানাও। তাঁর হৃদয় মহৎ, তোমাকে ক্ষমা করতে তাঁর দেরী হবে না।"

অনুপ্রভার সহিত যখন অশোকের দেখা হইল তখন তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল ও কাতর ভাব দেখিয়া অশোকের দুঃখের অবধি রহিল না। তাহার উপর নির্ভর করিয়া সেই মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞার কথা প্রতিদিন জপ করিয়াছে ইহা ভাবিয়া অশোকের চিত্ত বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। এত ঘটনাতেও যে সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠে নাই, অনুপ্রভার কাতর মুখ দেখিয়া তাহা সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

সস্নেহে অনুপ্রভার হাতখানি নিজের মধ্যে লইয়া বলিল, "অনু, তোমাকে এতদিন মনের কথা বল্‌তে পারি নি। তুমি হয়ত আমাকে কত নিষ্ঠুরই ভেবেছ। তোমাকে পেলে কত সুখী হই ভগবান জানেন। তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে কি কষ্টে যে ছিলাম! ঠাকুরমা যেমন বল্‌ছেন তাই

হোক্। বল, আমার উপর তোমার কোন রাগ নেই, যে রাগে আমাদের বাড়ী থেকে চলে এসেছিলে ?"

ইহার উত্তরে অনুপ্রভা শুধু অশ্রুজলে অশোকের হাত সিক্ত করিয়া দিল।

বাহিরে আসিয়া অশোক ঠাকুরমাকে বলিল, "ঠাকুরমা, আপনার আদেশই তা হলে মাথা পেতে নিলাম।" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ঠাকুরমা হাস্যমুখে অশোককে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুরমার পৌত্র বিবাহের মন্ত্রাদি পূর্ব্ব হইতেই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ঠাকুরমার আদেশে সে-ই পুরোহিত হইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিল। সম্প্রদান করিলেন ঠাকুরমা।

যাহাকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে পাইয়াও, পিতা ইহাতে কতখানি আঘাত পাইবেন তাহা ভাবিয়া, অশোকের সমস্ত আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যেও কণ্টকের একটী ক্ষতবেদনা জাগিয়া রহিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের প্রাণ

আজ দিন দশেক হইল অশোকের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সেই যা অতুলকৃষ্ণ সন্ধান লইয়া আসিয়াছিলেন, সে চৌবেড়িয়া যাত্রা করিয়াছে। সরস্বতীর মনে সেই হইতেই একটা আশঙ্কা জাগিয়া রহিয়াছে। গত কল্য হইতে তাহা যেন আরও বাড়িয়াছে। আজ সকালে উঠিয়া তাঁহার মন এতই উদাস হইয়া গিয়াছে যে, মনে হইতেছে, তাঁহার আর সংসারে কিছুই করিবার নাই।

তাঁহার সংসারে ত কিছুরই অভাব, কোনও অশান্তি ছিল না। আজ পিতাপুত্রের মধ্যে কেন এই মেয়েটিকে লইয়া ব্যবধান রচিত হইয়া উঠিল? অথচ সেই মেয়েটিকে এত দিনে যেরূপ জানিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবার ত কিছুই নাই। তাহার মাসীমার মৃত্যুশয্যায় একটি প্রতিজ্ঞাকে সে যদি খুব বড় করিয়াই ভাবিয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কি বলিতে পারেন? তাঁহার পুত্রেরই যে তাহাতে কোন দোষ ছিল, তাহাও ত নহে। সরস্বতী স্বামীর ক্রোধের বিরুদ্ধেও কিছু মনে করিতে পারিলেন না! বন্ধুর সহিত কথা দিয়া তাহা কার্যে পরিণত না করিতে পারার ক্ষোভ যে তাঁহাকে কতখানি পীড়িত করিতেছিল, তাহা ত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

দোষ ঠিক কাহারও নাই, তথাপি কেন সংসারে এই অশান্তি প্রবেশলাভ করিল?

সরস্বতীর ভাবনা হইতেছিল, মেয়েটিকে রাখিয়া আসিয়া কেন অশোক

আবার তাড়াতাড়ি সেখানে গেল? সে ত তেমন ছেলে নয় যে, বিনা কারণে শুধু আপনার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইবে।

এইরূপ কত কথাই সরস্বতীর মনে হইতে লাগিল।

ধীরে সন্ধ্যা হইয়া গেল। প্রতি দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামী অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য ভিতরে আসেন, এবং কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় বাহিরে যান। আজ দুপুরের পর হইতে একেবারে তিনি ভিতরে না আসায়, তাঁহার চিন্তার ভার আরও বাড়িয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বালক ভৃত্য শম্ভুকে ডাকিয়া সরস্বতী বলিলেন, "শম্ভু, একবার বাইরে যা, ওঁকে ডেকে আন্‌গে।" শম্ভু তখনি চলিয়া গেল, এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কর্ত্তাবাবু এলেন না। রাগ করে বল্লেন, এখন যা।"

সরস্বতী দেবীর মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আশঙ্কা হইল, তবে কি অশোকের নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিয়াছে?

আরও খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন সরস্বতী বড়ই উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। শেষে আর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, পুরাতন ভৃত্য সনাতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও তো, তিনি কেন আস্‌ছেন না একবার জেনে এস।"

এই বৃদ্ধ ভৃত্য এই সংসারে কায করিয়া মাথার সব চুলগুলি পাকাইয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজ সরকারের অধীনে কায করিলে, এত দিন কোন কালে তাহাকে অর্দ্ধেক বেতন অর্থাৎ পুরা পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু দেশী লোকের নিকট বলিয়া সে বছর বছর 'এক্সটেন্সন' পাইয়া কার্য্যকাল ৪৫ বৎসর করিয়া ফেলিয়াছে; এবং দিন দিন তাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কারণ, অনেকের মতে পুরাতন বিশ্বাসী লোক মেলাই দুষ্কর, নূতন মেলা তেমন নহে।

সনাতন সাবেক কালের ভৃত্য। অতুলকৃষ্ণকে কোলে পিঠে করিয়া বড় করিয়াছে। তাই সে নির্ভয়ে বাবুর কাছে চলিয়া গেল; এবং একটু পরেই একখানি পত্র আনিয়া চিন্তাকুল ভাবে বউমার হাতে দিল।

এই পত্রখানি অশোক কলিকাতার বাসায় সস্ত্রীক আসিয়া পিতাকে লিখিয়াছিল। অদ্য অপরাহ্নের ডাকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে সরস্বতী পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

অশোক পত্রে সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছে। পিতার অনুমতি না লইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। তাহাতে সে নিজেকে যে কত অপরাধী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহা অতি করুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে অশেষ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছে যে, পিতার মার্জ্জনা ও অনুমতি পাইলেই সে সস্ত্রীক আসিয়া পিতামাতার চরণ বন্দনা করিবে। ইহাও সে লিখিয়াছে, যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে এমন দেবতুল্য পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বিষময় হইবে, এবং তাহার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর কেহই রহিবে না।

পত্রখানি দীর্ঘ ছিল। পাঠ শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, যেমন তিনি পত্র হইতে মুখ তুলিয়াছেন, দেখিলেন, স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার চোখ দুটা যেন বিদ্যুতের মত মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, এবং মুখমণ্ডলে আহত পিতৃগর্ব্বের একটা বিরাট ক্রোধের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীকে পত্র হইতে মুখ তুলিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ, তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত তেমন জোর করে কোনও কথা বলি নি। কিন্তু আজ যা বলছি, তা তোমাকে শুনতে হবে। আজ থেকে ছেলের কথা ভুলে যাও। মন

থেকে দূর না করতে পার, মুখে যেন এনো না। অন্ততঃ আমাকে যেন কখনও আর তার নাম না শুনতে হয়। আমি তাকে এইমাত্র চিঠি লিখে দিয়ে আসছি, আজ থেকে সে আমার কেউ না। যত দিন আমি বাঁচব, তার মুখ যেন আর না আমাকে দেখতে হয়।"

সরস্বতী দেবী স্তম্ভিতের মত সেখানে বসিয়া রহিলেন। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

অতুলকৃষ্ণ বারকয়েক পাইচারি করিয়া বলিলেন, "এত কষ্টে এত আশা করে এত ভেবে দুজনে মিলে যাকে মানুষ করলাম, একটা তিন দিনকার পরিচিত মেয়ের জন্যে সে অনায়াসে সব ভুলে গেল! উঃ!"

সরস্বতীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া অতুলকৃষ্ণ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তার জন্যে চোখের জল ফেলতে পাবে না— এ আমি তোমাকে বলে রাখছি। তোমার কাছেও যদি ওরকম ব্যাভার পাই, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে"—বলিতে বলিতে অতুলকৃষ্ণ পত্নীর রক্তহীন ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সরস্বতী অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া চক্ষের জল চক্ষে বিলোপ সাধন করিলেন।

অতুলকৃষ্ণ তখন ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সরস্বতীর চক্ষু ছাপাইয়া আবার অশ্রু ছুটিল। পুত্রের পত্রের সেই সকরুণ ভাষা, তাহার উদ্বেগ, তাহার সেই ক্ষমাভিক্ষা, এবং দৃঢ়চিত্ত স্বামীর ক্রুদ্ধ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অশ্রু নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন—"বাবা আমার! যখন এই কঠিন পত্রখানা তোর হাতে পড়বে, কি দুঃখের শেলই তোর বুকে বাজবে! কোথায় তোদের দুজনকে আজ রাজা-রাণীর আদরে ঘরে তুলে নেবো, তা নয়, তোদের আজ চিরজন্মের মত দূর করবার ব্যবস্থা শুনতে হল!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পিতৃক্রোধ।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কত ঘটনাই ঘটিয়াছে। মহা সমারোহে অতুলকৃষ্ণ গিরীশের কন্যার বিবাহ আপন ব্যয়ে আপন আলয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন—যদিও গিরীশ তাহাতে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। সরস্বতী স্বামীর অনুরোধে এই বিবাহের সব মঙ্গল [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতৃহৃদয়ে তখন যে দুঃখের তুফান উঠিত, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিতেন না। সকলের অসাক্ষাতে তিনি নিশ্বাস ফেলিতেন, আর ভাবিতেন, আহা—আজ অশোক যদি আমাকে এমনি একটি বধূ আনিয়া দিত, তাহা হইলে আমার জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ রহিত না।

অতুলকৃষ্ণের আহত অভিমান এত বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তিনি গিরীশের কন্যাকেই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই কেবল গিরীশের জন্য। গিরীশ প্রথম হইতেই তাঁহাকে অশোকের উপর ক্রোধ করিতে নিষেধ করি[illegible] আসিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ও বিষয় তোমার স্বোপার্জ্জিত নহে, পিতৃপুরুষের, ইহা হইতে তোমার পুত্রকে বঞ্চিত করিবার কোনও অধিকার তোমার নাই। তা ছাড়া, আমার মেয়েকে এরূপ অন্যায় ভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে কেন দিব?

এই উপলক্ষে দুই বন্ধুতে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও ঘটিয়াছিল।

অতুলকৃষ্ণ অশোককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাহাকে তিনি বর্জ্জন

করিলেন, তাহার পর মাস কয়েক অশোক অনুপ্রভাকে লইয়া কলিকাতার অতি কষ্টে কাটাইয়াছিল। পরে আপন অর্থকষ্ট জানাইয়া পিতার নিকট গৃহে ফিরিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিল। উত্তরে অতুলকৃষ্ণ রেজেষ্টী করিয়া পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দেন ও পৃথক একখানি পত্রে পুত্রকে লিখেন—ফিরিয়া আসিবার দরকার নাই—কোনও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি নিজের অভাব জানাইলে যেমন তাহাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, তোমাকেও সেইরূপ সাহায্যের জন্মে পাঁচশত টাকা পাঠান হইল।

কথা কয়টা অতি নিদারুণ ভাবে অশোকের হৃদয়ে আঘাত করিল। নিতান্ত পরের মত দেওয়া পিতৃদত্ত অর্থ সে ফেরৎ দিয়াছিল, এবং সেই দিনই তাহাদের কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিল। পিতাকে সে অত অভাব জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল এই উদ্দেশ্যে যে, হয় ত তিনি, পুত্র কষ্টে পড়িয়া অনুতাপ করিতেছে জানিতে পারিলে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

সরস্বতী এই টাকা চাওয়া ও টাকা ফেরৎ দেওয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় তখনি বুঝিয়াছিল, কোন অভিমানে পুত্র অভাবের মধ্যেও টাকাগুলি ফেরৎ দিয়াছে। ইহার দিন কয়েক পরেই গ্রামের একটি ছেলে কলিকাতায় যাইতেছিল। সরস্বতী গোপনে তাহার নিকট অশোকের ঠিকানা ও দুইশত টাকা দিয়া পুত্রকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে যেন এই টাকাগুলি লয়। কর্ত্তা রাগ করিয়াছেন, তাই তিনি তাহাকে কোনও পত্র লিখিতে পারিলেন না, ইহা যেন সে বুঝাইয়া বলে।

ছেলেটী দিন দশ পরে ফিরিয়া আসিয়া টাকাগুলি সরস্বতীকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, ও বলিয়াছিল যে, অশোক সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার পর হইতেই, পূর্ব্ব ঠিকানা ত্যাগ করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিতেছে না।

এ সংবাদ তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। আহা, বৌকে লইয়া কলিকাতা সহরে অর্থাভাবে কি কষ্ট পাইতেছে! যাদের রাজ্য, তারা এই রাজ্যপাট সব ছাড়িয়া ভিখারীর মত বেড়াইতেছে, আর আমি এই অট্টালিকায় সুখে বাস করিতেছি—এই সব ভাবিয়া সরস্বতীর মনে শান্তি ছিল না। ক্রমে তাঁহার আহারে রুচি চলিয়া গেল, কোমল শয্যা কণ্টকের মত বিঁধিতে লাগিল, দাস দাসীর পরিচর্য্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। মুখে আহারের গ্রাস তুলিতেছেন, এমন সময় মনে হইল, অশোকের হয় ত খাওয়া হয় নাই। হাত হইতে অন্ন পড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। অশোক যে এক পয়সা মাত্র না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অন্ধকার রাত্রে ঝড় বৃষ্টির দিনে তারা দুই স্বামী স্ত্রীতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার রাত্রি কাটিয়া গেল। যদি বা কোন সময় নিদ্রা আসিত, পুত্র সম্বন্ধে এক একটা কুস্বপ্ন দেখিয়া সেই স্বল্প নিদ্রাটুকু তখনি ভাঙ্গিয়া যাইত।

তাহার উপর সব চেয়ে কষ্টের কথা এই ছিল যে, স্বামীর নিষেধ ছিল বলিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ বৎসর মধ্যে একটি দিনের জন্যও স্বামীর সাক্ষাতে পুত্রের নামোল্লেখ করিতে পারেন নাই। স্বামীর অসাক্ষাতেও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া পুত্রের প্রসঙ্গ তুলিতেন না। যে চিন্তা যে কথা বুকের মধ্যে সারাক্ষণ তোলপাড় করিতেছে, তাহা বুকের মধ্যেই অহোরাত্র চাপিয়া রাখার যে কি দুঃখ, তাহা শুধু অনুভব করিবার,—বুঝিবার বা বুঝাইবার মত নহে।

এইরূপে অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা সহিয়া সরস্বতী রোগ-শয্যা গ্রহণ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন মাসীমা

পিতার নিকট হইতে যে দিন স্নেহহীন পত্র ও নিঃসম্পর্কিতের ভিক্ষার মত ৫০০৲ টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেই দিনই অশোক মনের দুঃখে সে টাকা ফিরাইয়া দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতার বাসা হইতে বাহির হইল। বামুন ও চাকরের মাহিনা শোধ করিয়া দিয়া, তাহাদের বলিয়া দিল, এ মাসটা ইচ্ছা করিলে এ বাসায় থাকিয়া তাহারা অন্য চাকরীর সন্ধান লইতে পারে; কারণ, সে মাসের ভাড়া তখনও অগ্রিম দেওয়া আছে। সে যে উঠিয়া যাইতেছে, বাড়ীওয়ালাকেও সে খবর জানাইয়া দিয়া গেল।

অশোক অভিমানে একটা নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আগে সে ভাবিয়াছিল, কোনও এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে। কিন্তু এমন কোনও বন্ধুর নাম তাহার মনে পড়িল না, যেখানে এরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে লইয়া অসঙ্কোচে উঠিতে পারে। হঠাৎ অশোকের মনে পড়িয়া গেল, ভবানীপুরে তাহার মায়ের দূর সম্পর্কের এক বোন আছেন। তখন সে গাড়োয়ানকে ভবানীপুরে যাইতে কহিল।

মাসীমা তখন উনানে ভাত চাপাইয়া, মালা লইয়া, দুয়ারের গোড়ায় মগ্নচিত্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন ও ঘন ঘন উঁকি মারিতেছিলেন, ফেন পড়িয়া আগুন না নিভিয়া যায়।

এই মাসীমাটি বড় সহজ মাসীমা নহেন। বৎসর খানেক বিধবা হইয়া কিছু গুছাইয়া উঠিয়াছেন। স্বামী ছিলেন নেহাৎ গোবেচারা মানুষ—কি একটা আপিসে কায করিয়া মাস গেলে মাত্র ৩০টি টাকা মাহিনা আনি-

তেন। এবং পাইপয়সাও হিসাব করিয়া গৃহিণীর হাতে দিতে হইত। ট্রাম ভাড়া বা পাণ সিগারেট বাবদ একটি পয়সা খরচ করিলেই অনর্থ হইত। স্বামী বেচারা স্থির করিয়া লইয়াছিল, এ জন্মটাই ভগবান তাহার উপরে সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিয়াছেন। জেলারের হুকুম মত কায কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, পয়সাকড়ির সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

একবার ভদ্রলোক একটা ভাল কায করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বুঝি ভগবান্ তাঁহাকে সকাল সকাল মুক্তি দিয়াছিলেন। ভাল কাযটা এই যে, ঝোঁকের মাথায় গোটা পঁচিশ টাকা ধার করিয়া তিনি দুই চারিজন বন্ধু বান্ধবদের সহিত কাশী ও গয়া এই দুটি তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঁচ মাসে টাকা কয়টা শোধ দিবেন। কিন্তু শেষে দিবার সময় গৃহিণী বিষম বাঁকিয়া বসিলেন। মাস শেষে মাহিনার ত্রিশটি টাকা গৃহিণীর হাতে সমর্পণ করিয়া যখনি সেই টাকার কথা পাড়িতেন, অমনি গৃহিণী হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন—"কেন, তখন যে বড় দরদ জানিয়ে তীর্থ করতে নিয়ে যাওয়া হল। তখন বুঝি টাকার কথা মনে ছিল না? সে মুখপোড়ার বা কি আক্কেল! টাকার আণ্ডিল—এই পঁচিশটো টাকা দেবতা ব্রাহ্মণ বলে ছাড়তে পারে না?" অথচ কোনও মাসে যে সেই বন্ধুকে পাঁচটা টাকা দিয়া পঁচিশটা টাকা গৃহিণীকে দিবেন, সে ভরসাও হইত না। ফলে এইরূপে অদ্যাবধি ছয় মাসে দেনা শোধ হইল না।

ছয়মাস পরে হঠাৎ একদিন বন্ধু টাকাটা চাহিয়া বসিলেন। কারণ গৃহিণী উক্ত বন্ধুকে টাকার আণ্ডিল বলিয়া অভিহিত করিলেও, তিনি মোটেই তাহা ছিলেন না। মাসীমার স্বামী তখন বড়ই লজ্জিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"দেখ ভাই, প্রায়ই ভাবি টাকাটা দেবো, অথচ দেবার সময় ভুলে যাই। কাল আমি দিয়ে আসবই।" গত কল্য মাহিনা পাইয়াছিলেন তাই একটু ভরসাও ছিল।

বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট বলিলেন, "দেখ, তোমার হাতে যে টাকা জমা আছে, তা থেকে আমায় ২৫টা টাকা দাও। নরেন বাবুর টাকাটা কাল দেবই দেব বলে এসেছি। অনেক দিন হয়ে গেল।"

স্ত্রী একেবারে অগ্নি হইয়া উঠিলেন। হাত মুখ উল্টাইয়া বলিলেন—"কার মাথা রক্ষে করতে কাশী গিয়েছিলে শুনি? আর গয়ায় গিয়ে কি আমার মা বাপের পিণ্ডি দিয়ে এলে?"

বেচারার এটু সাহস হইল না যে, বলেন, যাহার টাকা তাহার বাপের পিণ্ড দিতেই তিনি গিয়াছিলেন। রাত্রে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন—"সবটা না হয় দশটা টাকা দেও। আসছে মাসে কোনওখান থেকে হাওলাৎ বরাৎ করে বাকী টাকাটা যোগাড় করে নেব।" স্ত্রী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন, "এক কথা এক-শ বার ভাল লাগে না ছাই। এখন থাম। কাল ত আবার সকালে উঠে পিণ্ডি সিদ্ধ করতে হবে। একটু ঘুমুতে দাও।"

রাত্রে কিছু সুবিধা হইল না। সকাল হইল তবু টাকার যোগাড় হইল না! অবশেষে যাইবার পূর্ব্বে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, "তাহ'লে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দাও, নইলে যে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ইহার উত্তরে স্ত্রী এমন একটা উত্তর দিল যে, তাহা শুনিয়া স্বামী একেবারে স্তব্ধ হইয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া গেলেন। ঘরের তাকের উপর গৃহিণীর নিত্য সেব্য অহিফেন একটা কৌটায় থাকিত। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই কৌটার ভিতরকার ভরিটাক অহিফেন তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়া চুপটি করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। খুব যখন যন্ত্রণা আরম্ভ হইল তখন ছেলে স্কুলে। গৃহিণী আসিতেই সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এখন হাউমাউ করিলে পুলিশ ডাক্তার সব ডাকিতে হইবে। ফলে অন্ততঃ শ'খানেক টাকায় ধা

পড়িবে। যন্ত্রণার মধ্যেও ভদ্রলোকের ভয় হইতেছিল, যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যান, তবে জেলে গিয়া পাথর ভাঙ্গিয়া দিন কাটাইতে হইবে।

ডাক্তার ও পুলিশের কথায় গৃহিণী একেবারে চুপ। তবে স্বামীদেবতা আঁখি মুদিবার আগে, তাঁহাকে দিয়া দেবরের নামে অতি কষ্টে একখানি চিঠি লিখাইয়া লইলেন, যেন তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন পুত্রের জন্য সে মাসে মাসে অন্ততঃ ১৫টা করিয়া টাকা পাঠায়। ইহার কিছু পরেই স্বামী ভব-কারাগার হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করিলেন।

তখন গৃহিণীর চীৎকারে সমস্ত পাড়া নিনাদিত হইয়া উঠিল। এবং পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত অবগত হইয়া শীঘ্র শবদেহ সৎকার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাষ্ট্র হইল, মতি বাবুর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

পাড়ার আত্মীয় বন্ধু আগত হইলে, মাসী ঠাকুরাণী এমন চীৎকারে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এমন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওগো, তুমি যে এমন দাহ করার পয়সাটী পর্য্যন্ত রেখে যাওনি, আমি এখন একটা অপোগণ্ড ছেলে নিয়ে কি করব।" যে তাহার ফলে সকলে মিলিয়া শবদাহের খরচটা চাঁদা করিয়াই সম্পন্ন করিয়াছিল।

তার পর মাসী, স্বামীর ভ্রাতা ও আপনার ভ্রাতাকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন; এবং তাঁহারা আপন খরচে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া তুলিলেন।

মতি বাবুকে তাঁহার ভাই খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ হস্তাক্ষরের অন্তিম মিনতি উপস্থিত করা হইল, তিনি সজল চক্ষে বলিলেন—"বৌদিদি, তুমি দুঃখ কোর না, আমি মাসে মাসে তোমাকে ২০৲ টাকা পাঠাব। তার পর খোকা বড় হোক, ওকে আমি ভাল করে পড়াব।"

এইরূপে কুড়ি টাকার সংস্থান করিয়া মাসী তখন ভ্রাতার দিকে ঝুঁকিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "এবার দাদা আমাকে নিয়ে চল।"

দাদা ভগিনীকে বিলক্ষণ জানিতেন। ইঁহাকে লইয়া গেলে বাড়ীতে এক দিনেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। অথচ ভগিনীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ইনিও বলিয়া গেলেন, মাসে মাসে ১৫ টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

ভগিনী চোখের জল ফেলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি টাকা বন্ধ কর, মুটোর হাত ধরব, বাড়ীতে চাবি লাগাব, আর হস্‌নি গিয়ে উঠব। আর আমার কে আছে?" ইত্যাদি।

এই হিসাবে মাসীমার বিধবা হওয়ায় ৫ টাকা আয় বাড়িয়াছিল ও প্রায় ১০ টাকা খরচ কমিয়াছিল। গড়ে ১৫ টাকার সুবিধা হইয়াছিল। আর একটা সুবিধা হইয়াছিল, ভবানীপুরের এই বাড়ীটা দুই ভাইয়ের পৈতৃক বাটী। বড় বধূর উৎপাতে মতিবাবুর ছোট ভাই সপরিবারে কলিকাতার ভাড়াটে বাড়ীতে উঠিয়া যান। দুই ভ্রাতার দেখাশুনা হইত, তা এখানে নয়। হয় আফিসে, নয় ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে। বিধবা বড় বধূ বাড়ীর কথা তুলিলে তিনি বলিয়াই ছিলেন, "আমার অংশের কথা তুলবেন না, ও আমি কানাইকে দিলাম।" কানাই বা মুটু মাসীর বালক পুত্র।

এহেন মাসীমা, বাড়ীতে হঠাৎ অশোক ও অমুপ্রভাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ভাবিলেন, কলি-কালের ছেলে, বলা যায় না, হয় ত বা এই বয়সেই একটা উপসর্গ জুটিয়েছে!

অমুপ্রভা যে অশোকের বিবাহিতা স্ত্রী, এটা তিনি চট করিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, দূর সম্পর্কের মাসীমা হইলেও, এটুকু বিশ্বাস

তাঁহার ছিল যে, সরস্বতী তাহার ছেলের বিবাহে তাঁহাকে ফাঁকি দিবে না এবং সে যে রকম সাদাসিদে মানুষ, তাহাতে অশোকের বিবাহে গেলে সরোর কাছ হইতে অন্ততপক্ষে মাস দুয়েকের খোরাক যোগাড় না করিয়া ছাড়িবেন না। শেষে যখন অশোকের নিকট সব কথা শুনিলেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"হ্যাঁরে অশোক, বলিস্ কি! একেবারে ঘোর কলি! বাপকে বলা নেই, মাকে কহা নেই, আমি একটা ছেঁড়া মাসী এক পাশে পড়ে আছি, আমাকে একটা খবর দেওয়া নেই—একেবারে সাহেবদের মত মেমসাহেব নিয়ে হাজির!" বলিয়া মাসী একবার অশোক আর একবার অনুপ্রভার পানে চাহিলেন। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অশোক ও অনুপ্রভা দুজনকেই মাথা নীচু করিতে হইল।

তার পর একটা আপোষ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে মাসীমা কহিলেন, "তা করেছিস করেছিস, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি সরোকে, যে, ছেলে বৌ নিয়ে আমি যাচ্ছি, বৌভাতের যোগাড় কর।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশোক বলিল, "না মাসীমা, সে চেষ্টা বৃথা। আমি বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি আমাকে আর কখনও বাড়ী যেতে বারণ করেছেন।"

এ সংবাদে মাসীর বোনপোর প্রতি আকর্ষণ অনেকটা কমিয়া গেল। তখনি একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে যা হয় হবেখন। ছেলের ওপর বাপ মায়ের রাগ কতক্ষণ থাকে? তুমিও যেমন! তা দেখ, বৌমার বাপের কিছু পেয়েছ টেয়েছ তো? গায়ে ত কিছু দেখছি নে! সব বুঝি নগদ পেয়েছিলে?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "না মাসীমা, বাপ মা তো নেই, নগদ কেথেকে আস্‌বে?"

এবার মাসীমার সত্যই রাগ হইল। "হাঁ, সরোর উপযুক্ত ছেলে বটে, সেও যেমন বোকা, লেখাপড়া শিখে তুমিও তাই। নইলে বিষয় নেই আশয় নেই, এই রূপের খোচন খেড়ে মেয়েকে কোন্ পুরুষ ব্যাটাছেলে বে করে ?"

মাসীমা একেবারে সাত হাত বসিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি কিছু টাকাকড়ি হাতে করিয়া আসিয়া থাকে, মাসখানেক থাকে থাকুক, তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। কিন্তু গাঁট হইতে খরচ করিয়া উহাদের খাওয়াইতে হইবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই।

মাসীমাকে প্রারম্ভেই ঐরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অশোক বলিল, "মাসীমা, তোমাকে কোন বিপদে ফেলব না, ভয় নেই। আমি চাকরি বাকরির চেষ্টায় আছি। আমার কাছেও নিজের গোটাকতক টাকা এখনও আছে। শুধু তোমার বাড়ীতে দিনকতক থাকব, এই কষ্টটুকু তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

বলিয়া পকেট হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মাসীমার নিকট রাখিল।

মাসীমা তাঁহার ছোট ছোট চোখদুটা একবারে কপালে তুলিয়া বলিলেন, "হাঁরে অশোক, তুই শেষটা গরীব বলে আমায় এমন অপমান করলি ? আমি টাকার জন্যে এ সব বল্‌ছি, তুই ভাবলি ?"

অশোক বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "না মাসীমা, তা নয়। আমাদেরই তো তোমায় দেবার কথা। ছেলে যদি মাকে কি মাসীকে কিছু দেয়, সে কি তাঁরা গরীব বলে ?"

আগুনে জল পড়ার মত মাসী তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তা দিবি বৈ কি বাবা! জন্ম জন্ম দে। মা মাসী কি ভিন্ন, না পর ? কথায় বলে মা আর মাসী।"

বলিয়া মাসী নোট দুইখানা বেশ ভাল করিয়া অঞ্চল প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিলেন।

একটু ভাবিয়া পরে আবার বলিলেন, "তোদেরই ঘর বাড়ী, তোরা থাকবি তার আবার কথা? তা একটা চাকরি বাকরি ঠিক কর্, বৌকে নিয়ে এখানে থাক না যতদিন ইচ্ছে। তোর মেসো তো ভাসিয়ে গেল।"

এইরূপে অশোক কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক মাসীমার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কথা চলিত আছে— হাতী কেনা তত শক্ত নয়, যত শক্ত হাতী পোষা। তার অর্থ হয় ত এই—চোখ কাণ বুজিয়া একটা দমকা খরচ করিয়া একটা হাতী হয় ত অনেকেই কিনিতে পারে; কিন্তু নিত্য সেই অতিকায় চতুষ্পদ জীবের বিপুল খাদ্য জোটান অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। সেইরূপ, আশ্রয় জোটান আজিকার দিনে একটা বিশেষ শক্ত কায হইলেও, সেই আশ্রয়ে টিকিয়া থাকা আরও অনেক বেশী পরিমাণ কঠিন কায, তাহা অশোক কয়েক দিনেই বেশ করিয়া বুঝিল। কিন্তু যে বিষটুকু সে স্বেচ্ছায় মুখবিবরে ঢালিয়াছে, তাহা যতই বিস্বাদ ও যন্ত্রণাদায়ক হউক না কেন, তাহার সবটুকুই অশোককে নিঃশব্দে নীলকণ্ঠের মত যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইল।

মাসীমা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, আজিকার ছেলেমেয়েরা খুবই শক্ত। অশোক মুখে বলিয়াছে বটে বিবাহে কিছু পায় নাই, কিন্তু সেটা যে মোটেই সত্য নহে, সে বিষয়ে মাসীর কোন সন্দেহ ছিল না। এক দিন তিনি উভয়ের অসাক্ষাতে বাক্স খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে উহাদের প্রতি যে ভাবের উদয় হইল তাহার সহিত শ্রদ্ধার কোন সম্পর্ক নাই; কি সম্বল করিয়া যে এই দুটি প্রাণী জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না।

এক দিন তিনি চট্ করিয়া অনুপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "বলি বৌমা, অশোক সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করে এনেছে তো, না—"

এই 'না' র কুৎসিত ইঙ্গিতটুকু অনুপ্রভাকে এমন একটা আঘাত করিল, যাহাতে তাহার সমস্ত মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে যে অশোকের বিবাহিতা স্ত্রী, প্রতিবাদ স্বরূপ এ কথাটা বলিতেও লজ্জায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রশ্নটা ঠিক মাস্-শ্বাশুড়ীর উপযুক্ত হয় নাই, এবং এ কথাটা অশোকের কাণে উঠিলে খুব ভাল হইবে না ইহা ভাবিয়া, মাসী ব্যাপারটা সংশোধন করিয়া লইলেন, "তোকে কি আর সত্যিই বল্‌ছি তুই বিয়ে করা বৌ নস্? ও একটা কথার কথা বল্লাম। নেকি বেটি! অত বড় এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'ল, না পারলি একখানা গহনা আদায় করতে, না পারলি কিছু টাকা হাতে করতে। তাই তো রাগ হল। তুই তো পর নস্, তাই তোকে এই রকম করে বল্লাম।"

কথাটা এতই নোংরা যে, অশোককে সে কথা জানানো অনুপ্রভা একেবারেই অসম্ভব মনে করিল।

মাসীর ব্যবহার দেখিয়া অশোককে খুব সন্ত্রস্ত থাকিতে হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া সে ভবানীপুরেই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁহার ছেলে পড়াইয়া বারটি টাকার সংস্থান করিয়া লইল। মনে মনে স্থির করিল, আহার ব্যাপারটা এত লঘু ও সাদাসিদা করিতে হইবে, যাহাতে মাসীমার বারো টাকার বেশী খরচ না পড়ে। এক মাসের পর মাসী মাত্র বারটি টাকা হাতে পাইয়া মুখ ভারি করিয়া বলিলেন, "হাঁরে অশোক, এত লেখা-পড়া শিখে শেষে মাসের শেষে বারো টাকা আন্‌লি। কোথায় তোর আমার পর্য্যন্ত ভার নেবার কথা; তা তো গেল চুলোয়, এখন তোদের নিজেদের খরচটাও যোটাতে পাল্লিনে। কথায় বলে, কলকেতায় যার অন্ন যুটলো না, ভূভারতে তার কোথাও যুটবে না।"

অশোক বলিতে পারিল না যে, আসিয়াই সে মাসীমার হাতে যে দুখানা

নোট দিয়াছিল, তাহার সহিত এই বারোটি টাকা যোগ করিলে, দুজন লোকের দুমাসের খোরাক একপ্রকার চলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু তাহা না বলিয়া অশোক বলিল, "এ মাসটা তো মাসীমা তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। খুব চেষ্টা করছি, যাতে একটা সুবিধা মত পাই। চাকরি বাকরির যা বাজার আজকাল!"

মাসী কথাটা উল্‌টাইয়া বলিলেন, "তোর রাজার রাজ্যি যে বাপ। লেখ দিকি তোর বাবাকে, যে, আমি বড় ঠেকে পড়েছি, আমাকে ১০০৲, কি ২০০৲, কি ৩০০৲ টাকা পাঠাও, নইলে চল্‌ছে না। দেখি দিকি, কেমন তোর বাবা না পাঠিয়ে থাকে!"

অশোককে কোন উত্তর দিতে না শুনিয়া মাসীমা বিরক্ত হইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

অশোক দেখিল, এখানে থাকা আর কিছুতেই চলিতে পারে না। কেন না বেশী টাকাকড়ি না দিতে পারিলে, মাসীকে তুষ্ট করা যাইবে না; এবং মাসীকে তুষ্ট করিতে না পারিলে, এখানে থাকা দিন দিন কষ্টকর হইয়া উঠিবে। যেখানে হোক একটা চাকরির চেষ্টায় অশোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

এক দিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পুরাতন আত্মীয় হৃষীকেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। কে কি করিতেছে জিজ্ঞাসাবাদ হইলে, হৃষীকেশ বলিল, সে ত্রিপুরার এক পল্লীগ্রামে এনট্রান্স স্কুলে হেড্ মাষ্টারি করে। অশোকও তাহার ভরসা পাইয়া বেকার অবস্থার কথা জানাইয়া হৃষীকেশকে কোথাও একটা মাষ্টারি যোগাড় করিয়া দিতে বলিল। হৃষীকেশ জানাইল, তাহার স্কুলে একটা থার্ডমাষ্টারি খালি আছে, কিন্তু বেতন মাত্র ৩০৲ ত্রিশ টাকা; অশোক ইচ্ছা করিলে সে কায তাহার হইতে পারে।

এই দুঃসময়ে ৩০৲ টাকার চাকুরি অশোকের নিকট ৩০০৲ টাকা বলিয়া মনে হইল। সে বন্ধুকে অনুরোধ করিল যে, ছুটির সময় সে যেন তাহাকে এই কায দিবার ব্যবস্থা করে। ছুটি ফুরাইলেই সে যেন নিয়োগ-পত্র পাঠায় এবং একটা ছোটখাট বাড়ীভাড়া লইয়া রাখে, কারণ তাহাকে সস্ত্রীক যাইতে হইবে।

ইহার দিন পনের পরে হৃষীকেশের ছুটি ফুরাইল। সেখানে পৌছিয়াই সে অশোকের নামে নিয়োগ পত্র পাঠাইয়া দিল, ও পথ খরচের জন্য কিছু টাকা মণিঅর্ডার করিল।

অশোক তখন সময় বুঝিয়া মাসীমাকে জানাইল যে, সে ত্রিপুরার মধ্যে একটি চাকরি পাইয়াছে, এবং কালই সে অনুপ্রভাকে লইয়া সেখানে রওনা হইবে।

মাসীমা তখন ক্রন্দনের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, একটা দিনের জন্য শুধু মন পোড়াতে আসা! তোরা তো যাবি, আর আমি কেঁদে কেঁদে মরব। তার চেয়ে বরং এক কায কর, বৌমাকে আমার কাছে রেখে যা, তা হলে তবু ছুটিটুটি হলে আসবি। নইলে বুড়ো মাসীকে কি আর মনে পড়বে?" ইত্যাদি।

মাসীমার জিহ্বায় যে এত মধু লুকান ছিল, তাহা আজিকার পূর্ব্বে অশোক কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহার [illegible] কোন দিন সে মাসীর অন্তরের করুণ রসের কোন সন্ধান পায় নাই। তাই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া, মাসীর বাকচাতুর্য্যে তাহাকে কথা দিতে হইল যে, সে এখন চলিয়া গেলেও, মাসীর স্নেহ বিস্মৃত হইবে না, এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই দশ খানি মুদ্রা মাসীমাকে প্রণামী পাঠাইবে।

মাসী তখন শান্ত হইয়া উহাদের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পর দিন অশোক ও অনুপ্রভা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যথা সময়ে ত্রিপুরার এক সুদূর পল্লীতে অতি কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাসীর মনে তখন এক সংকল্প জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, একবার এই সুযোগে মুটুকে সঙ্গে লইয়া অশোকের পিতামাতার সহিত দেখা করিয়া সম্বন্ধটি ঝালাইয়া রাখেন। মনের মধ্যে একটা আশা উঁকি মারিতে লাগিল, এমন সোণার ছেলে মুটুকে পাইলে কি তাহারা পোষ্যপুত্র লইবে না? সরীকে কি তিনি সম্মত করিতে পারিবেন না?

দিন দুই পরেই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি অশোকদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ধনীর সন্তান, আজন্ম পিতামাতার স্নেহ যত্ন ও স্বচ্ছলতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া, যৌবনের প্রারম্ভেই এইরূপ দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া অশোক অনেকখানি মুষড়িয়া গেল। তদুপরি তাহার চিরদিনকার পোষিত একটা আকাঙ্ক্ষা একেবারে বিফল হইয়া যাওয়ায়, সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক আশা করিয়া সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সুচিকিৎসক হইয়া আপনার দেশে ফিরিয়া আজীবন দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিবে। এমন কত দরিদ্রলোক সে দেখিয়াছে, যাহারা ঘটি বাটী বিক্রয় করিয়া ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম দিয়াছে। শেষের দিকে সম্বল ফুরাইলে ঔষধ পথ্য অভাবে প্রিয়জনের মৃত্যু রক্তচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাহারা চিকিৎসকের যেটুকু মনোযোগ ও সাহায্য লাভ করে, তাহা না হইলেও খুব বেশী ক্ষতি হয় না। এমন অনেক বার সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, উদরাময়ের রোগী হাত দেখাইয়া সেখান হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের একটা অতি ক্ষীণশক্তি ঔষধ শিশিতে ভরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃথা ভাবিয়াছে, কতক্ষণে বাড়ী যাইয়া ইহা সেবন করিয়া সুস্থ হইবে।

সে ভাবিয়াছিল, এই সব দরিদ্র অজ্ঞান জনের সেবা করিয়া, তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া, সে একটা সত্যকার করণীয় কার্য্য করিবে। তাহার আগমনে যখন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ভরসা ও বিশ্বাসের হিল্লোল বহিয়া যাইবে, তাহাদের ভয়বিহ্বল পাণ্ডুর মুখে আশা ফুটিয়া উঠিবে, তখন সে তাহার শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে।

তাহা না হইয়া সে হইল এক অজ্ঞাত পল্লী-বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক! দীর্ঘ দিন মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল ছাত্রদের এই সব বুঝাইতে যে, এখানে কর্ত্তা একবচন সেজন্য ক্রিয়ার শেষে একটা s বসিবে; আকবর যখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর; বা একটা ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহু একত্র করিলে তাহা তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হইবে ইত্যাদি। আড়াই বৎসর কাল সে যে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিল, তাহা কোন কাযেই লাগিল না। সে ইহাতে না পারিল মিটাইতে অন্তরের তৃষা, না পারিল দূর করিতে তাহার জঠরের ক্ষুধা।

স্কুলের কায শেষ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া ভাবিত যে, কি পরিশ্রম করিয়া মাসে ত্রিশটী টাকা সে উপার্জ্জন করিতেছে। তাহার পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে কত লোক তাহার চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

মায়ের কাতর মুখখানি কল্পনা করিয়া প্রাণ তাহার আকুল হইয়া উঠিত। পিতার কথা যে মনে হইত না তাহা নহে, কিন্তু অভিমানের মধ্যে সে দুঃখ চাপা পড়িয়া যাইত। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাতে উঠিয়া মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার মন উদাস হইয়া উঠিত। মনে হইত যে মায়ের মনে যে দুঃখের ঝড় উঠিয়াছে, তাহারই উষ্ণ স্পর্শ তাহার বুকের কাছে আসিয়া পৌছিতেছে। দিনের আলো নিবিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার আসিবার সময় তাহার মনে হইত, যেন মায়ের মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনে আর একটা কষ্ট ছিল যে, অনুপ্রভাকে পাইয়া হৃদয়ের ভারটাকে একটুও লঘু করিতে পারিল না। কারণ, দুঃখের কথা বলিতে গেলেই অনুপ্রভাকে আঘাত করা হইবে। কিন্তু অনুপ্রভাকে কিছু না বলিলেও, বুঝিতে তাহার বাকি থাকিত না। স্বামীকে বিষণ্ণ দেখিলে, অপরাধিনীর মত সে চাহিয়া থাকিত। এক এক দিন কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিত—আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট।

এক দিন অনুপ্রভা ইতস্ততঃ করিয়া স্বামীকে বলিল, "আচ্ছা, আমাকে যদি তুমি ত্যাগ কর, তাহলেও কি বাবা তোমাকে ক্ষমা করেন না?"

অশোক প্রগাঢ় স্নেহে অনুপ্রভাকে কাছে টানিয়া বলিল, "ও কথা বোলো না। তোমার তো এতে কোনও দোষ নেই। আমি ত ইচ্ছে করেই তোমাকে এনেছি। তোমাকে যদি না পেতাম, তা হলেও ত আমি সুখী হতাম না। আমাদের অদৃষ্টে মা বাপের স্নেহ নেই, তাই পেলাম না!"

হৃষীকেশের সাহায্যেই অনেক সময় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিতে হইত। বন্ধু প্রধান শিক্ষক হওয়ায় কাযেও অনেক সুবিধা হইত।

এইরূপে অশোকের এক বৎসর কাটিয়া গেল। এমন সময় হৃষীকেশ পিতার আহ্বানে দেশে ফিরিয়া গেল। তাহার পিতা তাহার জন্য আর একটা ভাল কাযের যোগাড় করিয়াছিলেন।

হৃষীকেশকে ছাড়িয়া অশোকের প্রবাস আরও ক্লেশকর হইয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"যাও তুমি উঠে যাও—একটু বাহিরে গিয়ে বেড়িয়ে এস। সমস্ত দিনরাত এমনি করে এক জায়গায় বসে থাকলে যে অসুখ করবে। আমার কথা তুমি কিছুই শোন না।"

সরস্বতী স্বামীকে এই কথাগুলি অতি ধীরে ও ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন।

সরস্বতী অপরাহ্ণ হইতে এই বার লইয়া এই কথাগুলি তিন বার বলিলেন। অতুলকৃষ্ণ অগত্যা উঠিয়া অশোকের মাসীমাকে কাছে ডাকিয়া দিয়া বাহিরে গেলেন।

সরস্বতী পুত্রের জন্য দুর্ভাবনায় সেই যে রোগশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর উঠেন নাই। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

প্রকৃত ভালবাসা যেখানে থাকে, সেখানে মন বুঝিতে বাকি থাকে না। সরস্বতী মুখে কিছু না বলিলেও, রোগ শয্যায় শুইয়াও তিনি যে পুত্রের কথাটী ভাবিতেছেন, ইহা অতুলকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোধ ও অভি-মানে দৃষ্টি অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া, তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের সবখানি দেখিতে পান নাই। তাঁহার নিজের মনেও যে পুত্রের কথা উদিত হইতেছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল এই যে, একবার তিনি যে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিতেন, অশেষ ক্লেশকর হইলেও সে সংকল্প হইতে বড় একটা বিচলিত হইতেন না। ক্রোধ ও অভিমান হৃদয়ের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল বলিয়া, পুত্রের চিন্তা তাঁহাকে তত ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। আর পাছে ঐ দিকে মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, সেজন্য তিনি দিনরাত্রি জমিদারীর কাযকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। আগে অনেক গুরুতর বিষয়, অধিক আয়

ব্যয় আদি বিষয়ে বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিয়া নিজে অবসর ভোগ করিতেন। আজকাল কাহারও উপর অবিশ্বাস না হইলেও, কোন্ কাছারীতে কয়টি দিশালাই বাক্স খরচ হয়, তাহার পর্য্যন্ত হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব করিতেন ব্যয় কমাইবার জন্য নহে, শুধু সময় কাটাইবার নিমিত্ত।

গৃহিণী রোগশয্যা গ্রহণ করিবার পর হইতে অতুলকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও সাধ্যমত তাঁহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতেন না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অতুলকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন।

মাসীমা তখন মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন। দুদণ্ড যে বোনের সহিত নিরিবিলি বসিয়া গল্প করিয়া তাহাকে দিয়া নুটুর একটা কিনারা করিয়া লইবেন তাহারও যো নাই। মানুষটা যেন সব সময় সংসার নিয়া পড়িয়াই আছে। মরণ আর কি! মাসীমা সেই হইতে নুটুকে লইয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শয্যা হইতে দূরে আলোকটি কমাইয়া রাখা হইয়াছে। এখনও জ্যোৎস্না উঠে নাই; শুধু তারাগণের সামান্য একটু কিরণ গৃহমধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঘরের আলোক বাড়ে নাই।

স্বামী পুনরায় শয্যাপার্শ্বে বসিতেই সরস্বতী বলিলেন, "গেলে আর এলে যে! বাইরে একটু বসলেও না?"

অতুলকৃষ্ণ সস্নেহে সরস্বতীর তপ্ত ললাটের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমাকে এই রোগা শরীরে একলাটি রেখে বাইরে গেলেও তো আমার ভাল লাগবে না।"

স্বামীর এরূপ স্নেহ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি এই কথা কয়টি

শুনিয়া আজ তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অতুলকৃষ্ণ ঈষৎ অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া সরস্বতী বলিলেন, "হ্যাঁগা, একটা কথা বলব, শুনবে ?"

অতুলকৃষ্ণ পত্নীর কণ্ঠস্বরের কাতরতায় চমকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "শুনব, বল কি কথা।"

সরস্বতী বোধ হয় কথা কয়টা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতে-ছিলেন না। অতুলকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিলে বল।"

অতি অস্ফুট স্বরে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাগ করবে না ?"

অতুলকৃষ্ণ আহতভাবে বলিলেন, "না, করব না, বল। আমি কি তোমার উপর কখনও রাগ করেছি, না, তুমি কখনও রাগ করবার অবসর দিয়েছ ?"

সরস্বতী তখন বলিলেন, "দেখ, তুমি বারণ করেছিলে, তাই দেড় বছরের মধ্যে কোনও দিন তোমার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অশোকের নাম করিনি। যে নাম অষ্ট প্রহর বুকের মধ্যে বাজছে, সে নাম একটিবারের জন্যেও মুখে না আনার কি কষ্ট, তা ত তুমিও বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আর ত বেশী দিন আমার নেই। তাকে এইবার আসতে দেখ। এর পরে এলে ত আর দেখা হবে না। এই বেলা তাকে আনিয়ে দাও।"

অতুলকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সরস্বতীর শীর্ণ রোগজীর্ণ শয্যা-শায়ী শরীর, তাঁহার সকাতর অনুনয়, তাঁহার এতদিনকার এই সংকোচ আজ অতুলকৃষ্ণের চক্ষে নূতন আলোক আনিয়া দিল। এ তিনি করিয়াছেন কি ?

আপনার নিষ্ঠুর অভিমান বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বগুণে গুণময়ী পত্নীকে এমন নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে বসিয়াছেন! তিল তিল করিয়া তাঁহাকে একেবারে মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন! পুত্র ত তাঁহার একার নহে যে, তিনি তার উপর ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

মায়েরও তাহার উপর সমান অধিকার আছে। কেন তিনি একটিবারও সে কথা ভাবেন নাই? এই যে পুত্রের অদর্শনে মাতৃহৃদয় শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে, তাঁহার ক্রোধের ভয়ে এত দিনের মধ্যে একবার মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে নাই, 'ওগো, একটিবার তাকে আনাও!' ইহার জন্য তিনিই ত দায়ী। কি অধিকার তাঁহার ছিল পুত্রকে তাহার নিকট হইতে এমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার?

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সরস্বতী আর একবার প্রাণপণ সাহস করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, রাগ কল্লে? সে ছেলেমানুষ, না বুঝে প্রাণের টানে একটা কায করে ফেলেছে, তাই বলে কি তাকে ত্যাগ করতে হয়? তবু সে ত কোন নীচ কায করে নি, যাতে তোমার কোনও অপমান হয়। সে ত তোমারি ছেলে! না ভেবে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, তাই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে তোমার অমতে কায করে ফেলেছে। তবু তার পরেই ত তোমার কাছে কত করে ক্ষমা চেয়েছে। তোমার পায়ে পড়ি, তার দোষ ক্ষমা করে তাকে একবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর। বল করবে? বল, বল।" বলিতে বলিতে সরস্বতী কাঁদিয়া উঠিলেন।

অতুলকৃষ্ণ অত্যন্ত অপরাধীর মত পত্নীর অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "তুমি স্থির হও, শান্ত হও, আমি আজ চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছি। আমিই বুঝিতে পারিনি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। সত্যিই সে তেমন কিছু কঠিন দোষ ত করে নি—"বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত বাষ্পভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সরস্বতী এখন স্বামীর আশ্বাস বাক্যে আনন্দজনিত উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মুখ দিয়া এখন তাঁহার একটি কথাও বাহির হইতেছে না। শুধু নিষেধের সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়া এতদিনকার অবরুদ্ধ অশ্রুর বন্যা এখন দুইটী চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া ছুটিতেছিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বাড়ীখানি যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। অতুলকৃষ্ণের প্রকাণ্ড অট্টালিকার বেশীর ভাগ কক্ষগুলি আজ আলোকিত হয় নাই, যেন অন্ধকারের ভিতরকার কিসের একটা আশঙ্কা অজ্ঞাত বিভীষিকার মত সেখানে অগ্রসর হইতেছিল।

অশোককে সংবাদ দেওয়া হইবে, সে আসিবে, এই আশ্বাস বাক্য পত্নীকে বলিবার পর হইতে অতুলকৃষ্ণ পুত্রের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সংবাদপত্রে পুত্রকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সময়ে যাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অসময়ে তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দিল্লি, আগরা, এলাহাবাদ, কাশী, কটক, পুরী, ইত্যাদি নানা স্থান ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন নগর হইতে পত্র আসিতে লাগিল, কোথাও সে নাই। কলিকাতায় তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইতে লাগিল। কোথাও তাহাকে মিলিল না। অতুলকৃষ্ণের কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মরণাপন্না পুত্রগত-প্রাণা সাধ্বী নারীর জীবদ্দশায় বুঝি বা সে ফিরিবে না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি হতাশ হইতে লাগিলেন। মনে হইল, তাঁহাকে চিরকাল ধরিয়া অনুতপ্ত করিবার জন্যই বুঝি তাহার অজ্ঞাতবাস ফুরাইবে না।

অতুলকৃষ্ণের বৃহৎ অট্টালিকায় নিরাশার ছায়া দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। সরস্বতী দেবীর জীবনদীপ যে তৈল অভাবে নিবিয়া আসিতেছে তাহা চিকিৎসক হইতে দাসদাসী পর্য্যন্ত কাহারও অবিদিত

ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে এখনও পর্য্যন্ত আশার মোহ কাটাইতে পারেন নাই। প্রত্যহই প্রভাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহার জ্যোতিহীন চক্ষে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিত। যেন উৎকর্ণ হইয়া কহিতেন, ঐ না কে চুপে চুপে আসিতেছে, ঐ না কাহার পদশব্দ হইল—ঐ বুঝি সে আসিল!—পরে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যা হইতে একটা গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন। ঘরের ভিতরে বা বাহিরে চক্ষে কোন রূপ আলোক তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই অতুলকৃষ্ণের অন্তঃপুরে সর্ব্বদা সুসজ্জিত ও আলোকিত কক্ষগুলি আজ নিস্তব্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল বহির্ব্বাটীতে কোনও স্থানে আলোকের অভাব নাই, বরং প্রকটই আছে। সরস্বতী বলিয়াছিলেন, সমস্ত রাত্রি বাহিরে যেন আলোক থাকে, নহিলে সে যদি আসিয়া ফিরিয়া যায়।

অশোক যখন ফিরিল না, চিকিৎসকের পরামর্শ মতে অতুলকৃষ্ণ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, দেশভ্রমণে হয়ত শরীরও সারিবে—অন্ততঃ দিবারাত্রি প্রতীক্ষমান মাতৃ-হৃদয়ের প্রতীক্ষার কষ্ট কমিবে। কিন্তু সরস্বতী দেবী একটা দিনের জন্যও এ বাটী ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন—আমাদের অসাক্ষাতে যদি আসিয়া আবার চলিয়া যায়! একবার বাছা আসিতে চাহিয়াছিল, তুমি আসতে দাও নাই, আর আমি এমন করিতে দিব না।

এই এক কথাতেই ভ্রমণের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সরস্বতী দিনরাত্রি পুত্রের অপেক্ষায় রহিয়া রহিয়া অবশেষে মৃত্যুশয্যা আঁকড়িয়া ধরিলেন। শীঘ্রই যে এ অপেক্ষার অবসান হইবে, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সেদিন সমস্ত রাত্রির জন্য চিকিৎসকের রোগিনীর নিকটে থাকিবার

ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সরস্বতী তাহা পছন্দ করিলেন না, তাই তিনি পার্শ্বের একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে অতুলকৃষ্ণ রোগিণীর অবস্থা ডাক্তারকে অবগত করাইয়া যাইতেছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল লইয়া রহিয়াছেন, এই বুঝি পুত্রবিরহবিধুরা জননীর শেষ নিশ্বাসটুকু শূন্যে মিলাইয়া যায়। অতুলকৃষ্ণ শয্যাপ্রান্তে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে সরস্বতী ক্ষীণ কণ্ঠে কি কহিতেছেন, তাহা শুনিবার জন্য অতি নিকটে আসিয়া বসিতেছেন।

সরস্বতী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি মাস?"

অতুলকৃষ্ণ সস্নেহে পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া উত্তর দিলেন, "বোশেখ মাস।"

অতি মৃদুস্বরে, অনেকটা যেন আপনা আপনি সরস্বতী বলিলেন, "তিন বছর হল বাছা বাড়ী ছাড়া। আমি থাকতে সে আর এল না। আচ্ছা, আমার অসুখ, আমি আর বাঁচব না, এসব খবর দিয়েছিলে?"

আঘাত লাগিবে জানিয়াও অতুলকৃষ্ণকে বলিতে হইল, "হাঁ, দিয়েছিলাম।"

সরস্বতী আর্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার অসুখ টের পেলে সে আসবে না, এমন ছেলে ত সে নয়। তা হলে বাছার কি হল?"—সে কি তবে নেই? এ কথাটা সরস্বতী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার আর্ত কাতর কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশিত রহিল না।

অতুলকৃষ্ণ নিজের ব্যথা গোপন করিয়া কহিলেন, "তুমি ভেব না, তার কাছে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছেনি। ঢের যায়গা আছে যেখানে খবরের কাগজ দৈবাৎ যায় বা একেবারেই যায় না। হয় ত সে ঐ রকম একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। আর আমার লোকজন যারা খুঁজতে গিয়েছিল, তারা বড় বড় সহরেই গিয়েছে, ছোট খাট যায়গায় যায় নি। আমি কের

লোকজন পাঠাচ্ছি, তুমি ভেবো না। তার সন্ধানে আমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্যয় করব; তাকে ফিরিয়ে আনবই।"

চোখের জল না মুছিয়াই সরস্বতী বলিলেন, "সে যেন ফিরে আসে। এই ঘর খানিতে তার জন্যে আমি আশীর্ব্বাদ রেখে যাচ্ছি। তাকে আর বৌমাকে এই ঘরটা ছেড়ে দিও। তারা যেন এই ঘরটায় থাকে।"

খানিকক্ষণ সরস্বতী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অতুলকৃষ্ণের কণ্ঠ দিয়াও কোন কথা বাহির হইল না। আষাঢ়ের বৃষ্টির ধারার মত অন্ধকারে দুজনেরই চক্ষে অশ্রু বাহির হইল।

একটু পরে আবার সরস্বতী বলিলেন, "তারা এলে বোলো, আমি তাদের উপর একটুও রাগ করি নি। তারা এসে দুজনে আমাকে এক সঙ্গে মা বলে ডাকবে, এ আমার বড় আশা ছিল। কিন্তু তোমার উপর তো আমি কথা কইতে পারিনে, তাই আমি নিজে থেকে তাদের কোন খোঁজ করি নি। তারা যেন না ভাবে যে, মা পর্য্যন্ত আমাদের ত্যাগ করেছিলেন।"

মৃত্যুশয্যার যাত্রীর নিকট হইতে কি মৃদু, অথচ কি তীব্র তিরস্কার!

অতুলকৃষ্ণ পত্নীর ক্ষীণ দেহ ধীরে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি। আমায় মাপ করো!

সরস্বতী নিজের হাতখানি স্বামীর পিঠের উপর রা[illegible] বলিলেন, "ও কথা বলে আমার পাপ বাড়িও না। কখনও তো তু[illegible] আমার অমতে কোন কায কর নি। একটা যদি করে থাক, তার জন্যে কেন দোষী হবে তুমি? সব ভাল ভুলে গিয়ে একটা মন্দই মনে করে থাকব, এমন শিক্ষা ত তুমি আমায় দাও নি।"

দুজনের মুখে আর কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা বাহির হইল না।

সরস্বতী প্রথমে কথা কহিলেন, "আর তারা এলে, সব দোষ ক্ষমা করে বুকে তুলে নিও। রাজার ছেলে রাজার বৌ হয়ে তারা না জানি

কত কষ্টই পাচ্ছে। আর তাদের বোলো আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি তারা সুখী হবে। তাদের বোলো, আমি এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে, আমার অসুখের খবর পেলে সে নিশ্চয়ই আসত।"

অতুলকৃষ্ণ আর অশ্রু দমন করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অশ্রুধারায় সরস্বতীর গাত্রবাস সিক্ত হইতে লাগিল।

সেদিন শেষ রাত্রে সরস্বতী এ জগতে পুত্রের জন্য প্রতীক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, পরজগতে বুঝি স্বামী-পুত্রের প্রতীক্ষার জন্য চলিয়া গেলেন।

হায়, মানুষের এ প্রতীক্ষার কি কোন দিন শেষ হইবে না?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত পুত্র থাকিতে গৃহিণীর শ্রাদ্ধ অতুলকৃষ্ণকেই করিতে হইল। আত্মীয় কুটুম্বে ঘর ভরিয়া গেল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটিকে উৎসব হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছিলেন, বিশেষতঃ ঐ কাযে যখন এত ভোজন, কীর্ত্তন ও জনসমাগম হইয়াছিল। আত্মীয় কুটুম্বগণের সম্মিলিত হর্ষ-কোলাহলের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ শোকাকুল চিত্তে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে শূন্য মিষ্টান্ন পাত্রের রসপিপাসু মক্ষিকাবৃন্দের ন্যায় অনেক আত্মীয় বাড়ী ফিরিলেন না। তাঁহারা বাড়ীটাকে এমন করিয়া অধিকার করিয়া রহিলেন, যেন এখানে চিরকালের মত থাকিয়া যাইবার জন্যই তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল। দিবারাত্রি সেই আত্মীয়গণের কলকোলাহলে অন্তঃপুর ও বৈঠকখানা মুখরিত হইতে লাগিল; লোকাভাব আর রহিল না। কিন্তু এই সব আত্মীয়গণের আশ্রয়স্থল এই বিশাল অট্টালিকার অধিকারী যিনি, তিনি সকল বিষয়েই নিষ্ক্রিয় অনাসক্ত ও উদাসীন হইয়া রহিলেন। তাঁহার গ্রামসম্পর্কে জ্যেষ্ঠতুত ভাই, তাহার ভগিনীপতি, তাহার এক পিসে মহাশয় ও তস্য ভ্রাতা, অশোকের মামীমার কি রকম ভগিনী ইত্যাদিতে সংসার ভরিয়া উঠিল। ইহাদের অনেকেই স্বয়ং রহিয়া গেলেন। কেহ বা কার্য্যের খাতিরে চলিয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন গৃহিণী ও শিশু বা কিশোর পুত্রকে—উদ্দেশ্য এই পুত্রহীন ঐশ্বর্য্যবানের স্নেহদৃষ্টি যদি পুত্রের উপর পড়িয়া যায়। অশোকের সেই মামী ঠাকুরাণী ও তাঁহার দশ বৎসরের ছেলে হুটুবিহারী এ সকল আত্মীয়-কুটুম্বের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন।

সকলেই মুখে বলিতে লাগিলেন, এ সময়ে কর্ত্তাকে একা ফেলিয়া কি করিয়া তাঁহারা যান! এবং সময়ে অসময়ে নিজ নিজ পুত্র-কন্যাগণকে কর্ত্তার নিকট বসাইয়া তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

অতুলকৃষ্ণ তখন অন্তঃপুর একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়গণ অন্তঃপুরে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। অতুলকৃষ্ণ ইহা সহ্য করিয়া লইলেও, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য সনাতন তাহা সব সময়ে সহ্য করিতে পারিত না। এক দিন অপরাহ্নে সনাতন বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখিল, চারিটি কুটুম্বযুবক অশোকের পড়িবার ঘর অধিকার করিয়া সেখানে দিবা আরামে তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছে।

সনাতনের এতই সেটা অসহ্য হইয়া উঠিল যে, সে কর্ত্তা বাবুর কুটুম্ব বলিয়া ইহাদের খাতির করিতে পারিল না। এবং কপাট দুইটা খুব জোরে শব্দ করিয়া খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবু, আপনারা এ ঘরটা খুলবেন না। এ ঘর খোলা দেখ্‌লে বাবুর বড় কষ্ট হয়।"

"কেন কষ্ট হবে বাবুর? ঘর কি বন্ধ করে রাখ্‌বার জন্যে হয়েছে?" —হাতের একখানি তাস ফেলিয়া একটি যুবক কথাগুলি বলিলেন।

অপর একজন বলিলেন, "চাকর হয়ে একবার আস্পর্দ্ধা দেখেছ? এসব পিসেমশায়ের আস্কারার ফল।"

সনাতন কথাটা বিশেষ করিয়া গায়ে না মাখিয়াই বলিল, "চাকর ত বটেই বাবু। সেই জন্যই তো বাবুর কষ্ট হবার কথা ভাব্‌ছি।"

আর একজন বলিল, "তা তোমাকে চাকর বল্‌বে না ত কি মনিব বল্‌বে? তোমার বাবু আমার আপন কাকা তা জান? আমার ঠাকুরমার ঠাকুরদাদা আর তোমার বাবুর ঠাকুরদাদার বাবা মাসতুতো ভাই ছিলেন সে খবর রাখ? আমরা অমনি আসিনি যে ঘর ছেড়ে দিতে বল্‌বে!"

সনাতন বলিল, "আপনারা বাবুর আপনার লোক তা আমি জানি। ঘর তো ঢের আছে, আপনারা এ ঘরটা ছেড়ে অন্য একটি ঘরে থাকুন তাই বল্‌ছি। ঘরের তো আর অভাব নেই।" বলিয়া সনাতন ঘরের তালা হাতে করিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বাবু চতুষ্টয়ের মধ্যে তখন টেলিগ্রাফের ইংরাজীতে একটু আধটু কথা-বার্ত্তা চলিল, এখন কি করা কর্ত্তব্য। তিন জনের উঠিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জবরদস্ত গোছের বাকি লোকটি বলিল, "কিছু ভয় নেই, বসে খেলা যাক্। ও বল্লে বলেই কি হবে?"

অগত্যা সকলে যেমন খেলিতেছিল তেমনি খেলিতে লাগিল।

তখন সনাতন একটু কড়া মেজাজে বলিল, "বাবু, আপনারা ভদ্রলোক ভেবে ভদ্রভাবে বল্‌ছিলাম। এ ঘরে আপনাদের আস্‌বার অধিকার নেই। এ আমার দাদাবাবুর ঘর। এ ঘরে আমি দাদাবাবুকে ছাড়া আর কাউকে বস্‌তে দেব না। কর্ত্তা বাবু বল্‌লেও না।"

বলিয়া সনাতন, ঝড় যেমন বৃষ্টিভরা মেঘ কাটাইয়া দেয়, তেমনি চোখের জল ক্রোধ দিয়া সরাইয়া, ঘর বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। বাবু চতুষ্টয় আর বিলম্ব না করিয়া ঘরের বাহির হইল। একজন শাসাইয়া গেল, "কাকাবাবুর কাছে আমি এখনি যাচ্চি।"

সনাতন দুয়ার বন্ধ করিয়া চাবিটি আপনার কাছে রাখিয়া দুফোঁটা বিদ্রোহী অশ্রু মুছিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল।

আর এক দিন সনাতন দেখিল, কর্ত্তা ও গৃহিনী যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরটিতে কর্ত্তার কয়েকটি বর্ষীয়সী আত্মীয়া নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া পরচর্চ্চা করিতেছে। সরস্বতীকে সনাতন মা বলিত এবং সেই সতী নারীর ঘরখানিকে সে দেবমন্দিরের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিত। এই সব কটুভাষিণী আত্মীয়ারা পরনিন্দায় সেই মাতৃ-মন্দির কলুষিত করিবে, ইহা সে

কিছুতেই সহিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন বাবুদের সে যেমন করিয়া বাহিরে যাইতে বলিয়াছিল, মায়ের জ্ঞাতিকে তেমন করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহারা অপরাহ্নে যেমন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কার্য্যান্তরে গেলেন, অমনি সনাতন দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া কর্ত্তার উদ্দেশে বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিল।

উক্ত দুই বিষয়ের অভিযোগই কর্ত্তার নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট কোনও সুমীমাংসা না হওয়ায়, কেহ কেহ অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন যে চাকরের হাতে অপমানিত হইয়া তাঁহারা থাকিতে পারিবেন না। অতুলকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিলেন, "সনাতন আমার বাবার আমলের লোক। ওকে তো আমি চাকরের মত দেখি না। ও ঘর দুটোয় গেলে ওর মনে বড় কষ্ট হয়, তাই তোমাদের মানা করেছে। ওর কথায় কেউ কিছু মনে করো না।"

তখন অগত্যা আত্মীয়বৃন্দ কিছু না মনে করিয়াই চলিয়া গেলেন। আর অতুলকৃষ্ণ আত্মীয়বর্গ-সমাবৃত হইয়াও, সেই বিশাল ভবনের বহির্ব্বাটিতে নিতান্তই একাকী রহিলেন। কেবল দ্বিপ্রহরে একবার আহারের সময় বাড়ীর ভিতর আসিতেন। আহারান্তে তখনি আবার ফিরিতেন।

রাত্রের আহারটা পাচক বহির্ব্বাটীতে দিয়া আসিত। কিন্তু অধিকাংশ দিনই তাহা অভুক্ত রহিত এবং অত্যন্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রভাতে সনাতন তাহা অপর কাহাকেও ধরিয়া দিত।

রাত্রে প্রায়ই অতুলকৃষ্ণের নিদ্রা হইত না। অর্দ্ধেক রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে আসিতেন, ও বহির্ব্বাটীর ছাদের উপর পাইচারি করিতে করিতে দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেন। ভাবিতেন কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফেলিলেন। আপন অহমিকা রক্ষা করিতে গিয়া পুত্রকে হারাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নীরও প্রাণ নাশ করিলেন।

সে ছেলেমানুষ, ঝোঁকের বশে একটা কায করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি তাহার উপর এমন মর্ম্মান্তিক ক্রোধ কেন করিয়া বসিলেন? সত্য সত্যই সে যখন সেই মেয়েটিকে ভালবাসিত, তাহার উপর প্রকারান্তরে একটা প্রতিজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, তখন কেন তিনি তাহার দিকটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন না? ছেলেমানুষ সে—হৃদয়ের আবেগ দমন করিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাকে একপ্রকার বিনা দোষে ত্যাগ করিলেন—নিজে বৃদ্ধ বয়সে অহেতুক ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন কৈ? বিনা দোষে তাহাকে ত্যাগ করার শাস্তি স্বরূপই বুঝি ভগবানও গৃহিণীকে কাড়িয়া লইলেন।

অশোক কোথায় পথে পথে বেড়াইতেছে, হয় ত অর্থাভাবে দুঃখে পড়িয়া অকাল-মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহারই জন্য অশোক গৃহ-ছাড়া হইল, এই দুঃখ বুকে লইয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন।—এই সব ভাবিয়া অশ্রুজলে তাঁর প্রতি রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল।

এক দিন শেষরাত্রে ছাদের উপর পাইচারি করিতে করিতে অতুলকৃষ্ণ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া আলিসার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সব ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নীচে হইতে গিয়া সনাতন পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া করুণ কণ্ঠে বলিল,—"বাবু, এরকম কল্লে শরীর আর ক'দিন টিকবে?"

অতুলকৃষ্ণ বাহিরে বড় একটা আবেগ প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু সেদিন পুরাতন ভৃত্যের সমবেদনায় তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বলিয়া ফেলিলেন, "আর বেঁচে কি হবে সনাতন?"

তাহার দৃঢ়চিত্ত বাবুর মুখে ঐরূপ করুণ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সনাতন একেবারে উচ্ছ্বসিত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তার পর চোখ মুখ মুছিয়া বাবুর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "অমন কথা মুখে আনবেন না বাবু। খোকাবাবু ঠিক ফিরে আসবেন, এ আমি ঠিক আপনাকে বলছি। বৌমা

গিয়েছেন—সতী-লক্ষ্মী, তাঁর জন্য আর চোখের জল ফেল্‌বেন না।" বলিয়া সনাতন আর একবার হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন আবার অতুল-কৃষ্ণ সজল চক্ষে সনাতনকে শান্ত করিলেন।

শান্ত হইয়া সনাতন কোমল স্বরে বলিল, "বাবু, একবার চলুন, তীর্থ করে আসা যাক্। আমার মন বল্‌ছে, বিদেশে বেরুলেই খোকাবাবুকে পাওয়া যাবে। এতে আপনার শরীর মন ভাল হবে; খোকাবাবুরও খোঁজ করা হবে।"

কথাগুলি অতুলকৃষ্ণের মনঃপুত হইল। তিনি সম্মত হইলেন। সনাতন তাড়াতাড়ি করিয়া শীঘ্রই বাহির হইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

কতকগুলি আত্মীয় আত্মীয়া সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। কতকগুলি, বাড়ীতে থাকিলে আর্থিক সুবিধা হইবে ভাবিয়া, বাড়ী পাহারা দিবেন ভরসা দিলেন। সনাতনের ইচ্ছা ছিল না যে ইহাদের কেহই সঙ্গে যান, কিন্তু অতুলকৃষ্ণ যখন একবার তাহাতে সম্মতি দিয়া ফেলিলেন, তখন আর অন্য উপায় রহিল না।

তার পর এক দিন কতকগুলি আত্মীয় আত্মীয়া লইয়া অতুলকৃষ্ণ সনাতনের সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বাড়ী রহিলেন দু'একজন কর্ম্মচারী, কতকগুলি আত্মীয়-কুটুম্ব এবং ইঁহাদের সকলের কর্ত্রী হইয়া রহিলেন সপুত্রা সেই মাসী। সকলকেই বলিয়া যাওয়া হইল, যদি দৈবাৎ অশোক ইহার মধ্যে দেশে ফিরে বা তাহার কোন সংবাদ আসে, তাহা তৎক্ষণাৎ যেন অতুলকৃষ্ণকে জানান হয়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেলা ১০টায় ত্রিপুরার এক পল্লীর একটি একতালা ছোট বাড়ীর এক কক্ষে অশোক খাইতে বসিয়াছে ; অনুপ্রভা নিকটে পাখা হাতে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। দুয়ারের গোড়ায় একটি বছর দেড়েকের ছেলে একটি কাগজের বাক্সে একরাশ তেঁতুলের বিচি যত্ন করিয়া তুলিতেছে।

অশোকের শরীর খুব শীর্ণ। মুণ্ডিত মস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ কেশগুলি তাহার সদ্য রোগমুক্তির পরিচয় দিতেছে। অনুপ্রভা বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কৈ আজ যে কিছু খাচ্ছ না! এ ডালটুকু মেখে আর দুটি ভাত খাও।"

"উঃ যে গরম! এ সময়ে কি আর শুধু ডাল ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া যায়?" বলিয়া অশোক হাত তুলিয়া বসিল।

"কর কি! কর কি! উঠো না। না হয় দুধ দিয়ে আর চারটি খাও। আমি দুধ নিয়ে আসি।" বলিয়া অনুপ্রভা দুধের জন্য উঠিল।

অশোক বলিল, "বস, বলি শোন। এখন কি দুধ দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে যে খাব?"

অনুপ্রভা অগত্যা পুনরায় বসিয়া বলিল, "তা হলে কি দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে তাই বল।"

অশোকের বাম দিকে আসন হইতে একটু দূরে একটা হাঁড়ির মধ্যে কাটা তেঁতুল ছিল। তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া অশোক কহিল, "ইচ্ছে করছে এমনি করে একটু তেঁতুল নিয়ে—এমনি করে পাতে ফেলে, এমনি করে ডালের সঙ্গে বেশ করে মেখে নিয়ে এমনি করে খেয়ে ফেলি!

বলিয়া অশোক সত্য সত্যই হাঁড়ি হইতে খানিকটা তেঁতুল লইয়া পাতে ফেলিল ও ডালের সহিত বেশ করিয়া মাখিয়া ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া ৪।৫ গ্রাসে তাহা শেষ করিয়া ফেলিল।”

“ওমা, কি হবে! তুমি এই রোগা শরীরে অতখানি তেঁতুল খেলে কি করে!”

—খানিকটা হাসি অধরের নীচে চাপিয়া অনুপ্রভা গালে হাত দিয়া কথাগুলি বলিল।

অশোক তৎক্ষণাৎ বাম হাতখানি তেঁতুলের হাঁড়ির দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, “কি করে খেলাম আর একবার তাহলে ভাল করেই দেখ।”

“রক্ষে কর, আর ভাল করে দেখিয়ে কায নেই!” বলিয়া অনুপ্রভা মৃদু হাসিয়া তাড়াতাড়ি তেঁতুলের হাঁড়িটা সরাইয়া রাখিল।

“তবে আর আমার দোষ নেই,” বলিয়া অশোক হাসিতে হাসিতে গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্কুলে পড়ান, বাড়ীতে পড়ান ও তদুপরি অভাব দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট সবগুলি এক সঙ্গে মিলিয়া অশোকের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছিল। হৃষীকেশ চলিয়া যাওয়ার মাসছয়েকের মধ্যে সে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশে শয্যাশায়ী স্বামী ও শিশুপুত্রকে লইয়া অভাবের মধ্যে অনুপ্রভা একেবারে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কিন্তু অনুপ্রভা ও অশোকের মধুর স্নিগ্ধ স্বভাবের জন্য সকলেই তাহাদের ভালবাসিত। তাই প্রতিবেশীদের সাহায্যে এ বিপদ এক রকমে কাটিয়া গিয়াছিল। অনুপ্রভাও সুগৃহিণীর মত এই সামান্য আয়ের মধ্য হইতেও প্রতিমাসে কিছু কিছু বাঁচাইত। এই সঞ্চিত অর্থ স্বামীর রোগের সময় তাহার খুব কাযে লাগিয়াছিল। তিন মাস অবিরাম শুশ্রূষার পর অনুপ্রভা অনেক কষ্টে স্বামীকে যমের দুয়ার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

ঐ সময়ে অনুপ্রভার খুবই ইচ্ছা হইত, স্বামীর অসুখের সংবাদ একবার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু রোগের প্রারম্ভে অভিমানের বশে অশোক স্ত্রীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে, সে বাঁচিয়া থাকিতে যেন পিতামাতাকে সংবাদ দেওয়া না হয়।

যে সময়ে অশোক মরণাপন্ন, ঠিক সেই সময়ে সরস্বতীর অনুরোধে অশোকের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছিল ও সংবাদ পত্রে তাহাকে ফিরিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন কেই বা সংবাদপত্র দেখে, আর সেই ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র পল্লীপ্রান্তে কেই বা সংবাদ লইতে আসে।

কিন্তু মায়ের প্রাণ যখন বড়ই কাঁদিত, তখন অশোক সেই অজ্ঞানাবস্থার মধ্যেও যখনই জ্ঞান হইত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত। প্রাণের মধ্যে শুধু মার কথাই তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। যে রাত্রের শেষভাগে সরস্বতী অশোক অশোক করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিয়াছিলেন, তখন অশোক হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন মাকে অনেকদিন পরে দেখিতেছে এই ভাবে "ওমা, মা, মাগো অনেক দিন পরে মা" এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

জাগ্রদবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় তা অশোক ঠিক বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, যেন তাহার মা শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, "বাবা, বড় কষ্ট পেয়েছিস। আশীর্ব্বাদ করি এবার তোর ভাল হবে।" যখনি ভাবে তখনি মায়ের সেই রাত্রির মূর্ত্তি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সদ্য স্নাত ও মার্জ্জিত মায়ের মুক্ত কেশপাশ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর রেখা, পরণে লোহিতপ্রান্ত বস্ত্র, মুখের এক পার্থিব শান্ত সৌম্যভাব—এসব অশোক কখনও ভুলিবে না।

অশোক অনুপ্রভার সাহচর্য্যে সময়ে সময়ে এসব কথা ভুলিয়া থাকিত। কিন্তু একাকী হইবামাত্র আবার সে কথা মনে উঠিত।

এইরূপে ভাগ্যচক্রে মাতা পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিরদিনের মত চক্ষু মুদিয়াছিলেন, এবং পুত্রও দূর দেশে তাঁহার কোনও সংবাদ না পাইয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ আহারান্তে বিশ্রামের পর অনেক দিনের ইচ্ছা অশোক কার্য্যে পরিণত করিল। মা যখন পরলোকে, তখন সে মাকে একখানি পত্র লিখিল যে, পিতা ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ২।৩ বার পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে বুঝিয়াছে যে পিতৃস্নেহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু মা তাহাকে কখনও ভুলিবেন না, এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় আছে। মাকে দেখিবার তাহার বড়ই ইচ্ছা, সে জন্য মায়ের একবার অনুমতি পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইবে। পিতা আশ্রয় না দিলে আবার চলিয়া আসিবে। কিন্তু মাকে একটিবার না দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিতেছে না।

অতুল বাবু যখন অশোকের একটা সংবাদ পাইবেন এই আশায় একটা স্থান হইতে আর একটা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় এই আকাঙ্ক্ষিত পত্র তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। মাসী তখন বাড়ীর কর্ত্রী। অশোকের যদি কোন সংবাদ আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। চিঠি পত্র যাহাতে প্রথমে তাঁহার কাছে আসে, এ ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিরোনামায় মা-ঠাকুরাণী দেখিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পুত্রের কত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত সেই পত্রখানি সাবধানে গোপনে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তীর্থ-পথে পিতা অনুশোচনার সহিত বলিতে লাগিলেন, হায়, অশোকের অভিমান এখনও গেল না। একখানা পত্র লিখিয়াও সে সংবাদ দিল না।

আর প্রবাসে পুত্র ভাবিতে লাগিল, মাও এত দিনে আমাকে ত্যাগ করিলেন! হায় অদৃষ্ট!

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী ঘুরিয়া অতুলকৃষ্ণ সনাতনকে লইয়া পুনরায় কাশী ফিরিতেছেন। কাশী আসিয়া আত্মীয়গণকে বাসা করিয়া রাখিয়া, তিনি সনাতনকে লইয়া অন্যান্য স্থানে বাহির হইয়াছিলেন।

অশোকের সন্ধান কোথাও মিলে নাই। কাশীতে আরও দিন পনের থাকিয়া আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে লইয়া বরাবর কলিকাতায় আসিবেন। সেখানে অন্ততঃ ৪।৫ মাস থাকিয়া অশোকের সন্ধান করিবেন। কে জানে হয় ত সে কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছে।

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে সনাতন অতুলকৃষ্ণকে একেবারে নির্ব্বন্ধ করিয়া ধরিল—"বাবু, এখানে একটু নামুন। এর পরে হলে আর হবে না।"

আহারাদি করিয়া সকাল ৮টার সময় ট্রেণে উঠা হইয়াছিল, এখন রাত্রি ১০টা। সনাতন সেই সন্ধ্যা হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কি করিয়া বাবুকে কিঞ্চিৎ আহার করাইবে। ট্রেণে বসিয়া বাবু কিছু খান্ না, তাই এখনও কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। সে অন্যান্য আরোহী বাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছে যে, এই ষ্টেশনে ট্রেণ ১৫ মিনিট থামিবে। তাই সে স্থির করিয়াছে, বাবুকে এখানে গাড়ী হইতে নামাইয়া, যেমন করিয়া হউক কিছু আহার করাইয়া লইবে; এবং বাবুকে সেই অভিপ্রায়ে অনেক পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাযেই অতুলকৃষ্ণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। সনাতন বাবুকে সঙ্গে করিয়া

একেবারে দীর্ঘ প্লাটফরমের শেষভাগে একটু নিভৃত স্থান দেখিয়া, সেখানে কম্বল পাতিয়া বাবুকে বসাইল ও ফলমূল যাহা সঙ্গে ছিল কাটিয়া রেকাবী বাহির করিয়া তাহাতে সাজাইয়া দিল ও তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিল।

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সনাতন, তোমার এ সব খেতে গেলে গাড়ী ছেড়ে দেবে এ জেনে রাখ। তখন উপায়?"

সনাতন বলিল, "আপনি কিছু ভাববেন্ না বাবু,—নিশ্চিন্দি হয়ে খান। বেহারী বসে রইল, আপনার খাওয়া হলে এগুলো নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেখন। আমি ততক্ষণ এগিয়ে গিয়ে থাকি, তেমন তেমন দেখ্‌লেই ছুটে এসে খবর দেব।" বলিয়া, অপর যে চাকরটি সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে বাবুর কাছে বসাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গাড়ী সেদিন ঐ ষ্টেশনে ৫মিনিট বিলম্বে পৌঁছিয়াছিল। সনাতন কিন্তু সে খবর রাখে নাই। সে বাবুকে নিশ্চিত ভাবে ভরসা দিয়া গিয়াছিল যে, দরকার বুঝিলে সংবাদ দিবে। কিন্তু এ ধারে লোকের ব্যস্ততা, ষ্টেশন মাষ্টারের আবির্ভাব ইত্যাদি দেখিয়া সে নিজেই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর খানিকটা পরে ষ্টেশনে মাষ্টারের ইঙ্গিতে হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফরমের লোকগুলি ছুটিতে ছুটিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত প্লাটফরমে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

সনাতন এবার বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেল। বাবু আসিয়া তাহাকে কি বলিবেন? ছুটিয়া সে ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট যাইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল—"হুজুর, আমার বাবু গাড়ীতে জলবিন্তি মুখে দেন্ না। অনেক করে বলে তাঁরে ঐ মহাড়ায় বসিয়ে একটু জল খেতে দিয়েছি। আপনি গাড়ীটা একটু থামিয়ে দিন।"

ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব তাহার একবর্ণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "নেি হোগা, টিকেট লেনে হোগা।"

—বলিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

এদিকে গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিবা মাত্র গাড়ী ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল সনাতন দেখিল শেষপ্রান্ত হইতে বাবু ছুটিয়া আসিতেছেন। গার্ড সাহে তাহার নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া—নিজের গাড়ী আসিলেই উঠিয় পড়িবেন সেই অপেক্ষায় আছেন। সনাতনের মাথা ঘুরিয়া গেল। মুহূর্তে একটা মৎলব তাহার মাথায় আসিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া সে ছুটিয়া গিয়া, যেমন গার্ড হাত দিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিলেন, অমনি দুই হাত দিয়া গার্ড সাহেবকে জড়াইয়া ধরিল।

ষ্টেশনময় একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। গার্ড সাহেব তো অবাক্! তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। গাড়ী আর একটু গিয়াই থামিয়া পড়িল। ষ্টেশনের পুলিশ ছুটিয়া আসিয়া সনাতনকে ধরিয়া ফেলিল। গার্ড সাহেব তখন ব্যাপার একটু বুঝিয়া, একটা ঘুঁসি উঠাইলেন।

এমন সময় অতুলকৃষ্ণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। ব্যাপারটা গার্ড সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্য তিনি গাড়ী পাইবেন না এই আশঙ্কায় গাড়ী থামাইবার এই শেষ বিপজ্জনক উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কার্যটা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্য তিনি ও ভৃত্য দুজনেই মার্জ্জনা চাহিতেছেন। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টারেরও ইহাতে কিঞ্চিৎ দোষ আছে, যেহেতু দুই মিনিট আগে গাড়ী ছাড়া হইয়াছিল।" বলিয়া অতুলকৃষ্ণ নিজের মূল্যবান্ ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন যে এতক্ষণে ঠিক সময় হইয়াছে।

গার্ড সাহেবের তখনি মনে হইয়াছিল, যেন একটু আগে ছাড়া হইতেছে;

কিন্তু তাঁহার ছাড়িলেই ভাল বলিয়া ও বিষয়ে মাথা ঘামান নাই। যিনি দায়ী—তিনি ষ্টেশন মাষ্টার।

তিনি কাযের ঝোঁকে অত খেয়াল করেন নাই। টেলিগ্রাফ আফিসের ঘড়ি ঠিক ছিল, কিন্তু বাহিরে যে ঘড়ি ছিল তাহা দেখিয়া তিনি গাড়ী ছাড়িবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গার্ড সাহেব লোকটি ছিলেন সহৃদয়। ব্যাপার বুঝিয়া খুব উচ্চ হাসিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া সনাতনের পিঠ চাপড়াইয়া Faithful servant, fathful servant বলিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিলেন। ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিলেন, পরের ষ্টেশনে ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দিব।

বলিয়া নিজের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। সনাতন ও সভৃত্য অতুল-কৃষ্ণও নিজ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ সনাতন, রাস্তাঘাটে খাওয়া খাওয়া করে অত ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। আর একটু হলেই এখানে আটক পড়েছিলাম আর কি? তবে গাড়ী থামাবার অব্যর্থ উপায় দেখিয়ে দিলে বটে!"

সনাতন অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণ পাঁচটায় ভুবন সরকারের লেনে কতকগুলা খোলার বাড়ীর মধ্যে একটি বাড়ীর দুয়ারের নিকট যাইয়া অশোক ডাকিল, "কুমুদ।"

ভিতর হইতে বাবা বাবা বলিয়া অশোকের শিশুপুত্র কুমুদ আসিয়া তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া দিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া আহ্বান করিয়া লইল। দুয়ার বন্ধ করিয়া অশোক ভিতরে গেল।

অনুপ্রভা অতি কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, স্বামীর মলিন মুখ দেখিয়াই অনুপ্রভা বুঝিল, আজও তিনি বিফল হইয়া আসিয়াছেন।

ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়াও অশোক নিস্তার পায় নাই। অসুখের সময় বিনা মাহিনায় তাহার ৩ মাস ছুটি মঞ্জুর হইয়াছিল। ঐ ৩ মাস সময়ের জন্য ঐ গ্রামেরই সদ্য আই-এ পাশকরা একটি যুবক উক্ত কার্য্যের জন্য আগে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। তার পর ঘটনাচক্রে ঐ লোকেরই ঐ কার্য্যটি স্থায়ীভাবে মিলিয়া গেল এবং অশোক পদচ্যুত হইল। ঘটনাচক্র আর কিছুই নহে—কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন যে, স্থানীয় লোক বিদেশী লোক অপেক্ষা ভাল। সেজন্য একটি কারণ দেখাইয়া বলিলেন যে, অশোক বাবু রোগে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, বৎসর কয়েক তাঁহার রীতিমত বিশ্রামের দরকার। সুতরাং তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অতি কষ্টে সংসার চালাইয়া, এবং বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়া যে টাকা পাওয়া যাইত, তাহার একটিও খরচ না করিয়া, অনুপ্রভা যে অর্থ সঞ্চিত

করিয়াছিল, সে সমস্ত অশোকের রোগে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় চাকরি যাওয়ায় অশোক ও অনুপ্রভা অত্যন্ত অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহার উপর একটী কন্যা প্রসব করিয়া অনুপ্রভা পীড়িত হইয়া পড়িয়া অশোককে আরও অসহায় করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষটা অনুপ্রভার অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, এদিকে বেকার অবস্থা এমনই সাংঘাতিক হইয়া উঠিল যে, অশোক ২।১ জন শুভানুধ্যায়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসাই স্থির করিয়া ফেলিল। অগত্যা অশোক সেখান হইতে এক ভদ্রলোকের নিকট আংটি বন্ধক দিয়া মাত্র ২৫টি টাকা সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া এই খোলার বাড়ীতে উঠিয়াছিল।

আজ দুই সপ্তাহ হইল অশোক সপরিবারে কলিকাতা আসিয়াছে। অনুপ্রভার একখানি মাত্র যে অলঙ্কার ছিল, তাহা বেচিয়া পথ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কোনমতে করিয়াছিল। কিন্তু রোগ একটু কমিতে না কমিতে হাত শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশোক কোথাও একটা ১০ টাকা মাহিনার টিউশনিও যোগাড় করিতে পারে নাই।

অশোক শ্রান্তভাবে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর এক দাগও ওষুধ নেই, নয়?"

প্রশ্নের সহিত অশোকের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রভার বুকও যেন অনেকখানি বসিয়া গেল। তবু সে মুখখানি কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কাল তো রাত বেশী হয়ে গেলে আর খাই নি। আজ সকালে সে দাগটা খেয়েছি। আজ আর ওষুধের দরকার হবে না। শরীরটা একটু ভালও বোধ হচ্ছে।"

"কোথা ভাল বোধ হচ্চে! ও সব বলে আমার পাপের বোঝা আ বাড়িও না অনু।"

কথা কয়টা অশোক নিতান্ত হতাশ হইয়াই বলিল।

অনুপ্রভা অতি ধীরে ধীরে স্বামীর অবসন্ন হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল, তুমি "অমন মুষ্‌ড়ে পোড়ো না। তুমি দেখো, ভগবান মুখ তুলে চাইবেনই।"

অশোক নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল, "তার আগে বুঝি বা তোমাকেই হারাই, অনু! এ রকম দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে না অষুধ, না পথ্য, আর ক'দিন বাঁচবে?"

দুঃখের মধ্যেও আনন্দে অনুপ্রভার চোখের কোণায় কোণায় জল ভরিয়া আসিল। একটু থামিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখো গো, আমি এখনি মরছিনে। তোমাকে নিশ্চিন্ত সুখী না দেখে আমি কি করে মরি বল?"

এ সান্ত্বনা অশোককে শান্ত করিতে পারিল না। অশোক সবিষাদে কহিল, "কিছুতে সুবিধে করতে পারছিনে অনু। কত যায়গায় চাকরির চেষ্টায় গেলাম, সব মিছে হ'ল। আফিসে আফিসে ঘুর্‌লাম—বল্লে, খালি নেই। কত লোকের দোকানে গেলাম, যদি যা তা একটা কায পাই—তারা বল্লে, ব্যবসা অত সোজা নয় যে আস্‌বে আর কায কর্‌বে। এও শিখ্‌তে হয়। এদিকে কাল থেকে হাতে তো একটা পয়সাও নেই! কি যে করি!"

স্বামীর এই অবসন্ন ও নিরাশ ভাব অনুপ্রভার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া দিতে লাগিল। মাত্র আধ পোয়াটেক চাউল, সেই চাউলে যে ভাত হইয়াছিল তাহা খোকা খাইবার পর মাত্র ৩।৪ গ্রাস অবশিষ্ট ছিল। তাই —উদরস্থ ঠিক বলা যায় না—প্রায় 'কণ্ঠস্থ', করিয়া বেলা ১১টার সময়

স্বামী বাহির হইয়াছিলেন, আর এই অপরাহ্ণে সমস্ত কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিয়া কোথাও কিছু যোগাড় করিতে না পারিয়া অবসন্ন শরীর মন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিতে করিতে কহিল, "একটা কথা বল্‌ব, রাগ করবে না ?"

অশোক। কি, বল! এত সুখে রেখেছি, এর উপরে আবার রাগ করব ? তা হলে আমার বাহাদুরি আছে বটে।

অনুপ্রভা। তোমার ঐ এক কথা। আচ্ছা দেখ, তুমি যে ৩।৪ মাস আগে মায়ের নামে চিঠি লিখেছিলে, হয়ত সে পৌঁছে নি, কি আর কোন গোলমাল হয়েছে। এক দিন তুমি নিজে যাও না কেন ? কখনও কষ্ট সহ্য করনি ; কষ্টের আর অবধি নেই তোমার।

অশোক। ও কথাটা মুখে এনো না। বেঁচে থাকতে আর বাড়ীর দ্বারস্থ হব না। যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করব সেও স্বীকার, তবু বাড়ী আর যেচে যাব না। এখানে এসেও তো চিঠি দিয়েছিলাম বাবার নামে—কোন উত্তর আসে নি।

অনুপ্রভা। কি কুক্ষণে তুমি আমায় গ্রহণ করেছিলে! তাইতে তোমার আজ এই দুঃখ। নইলে তোমার অন্ন খায় কে ?

বড় দুঃখে অনুপ্রভা এই কথাটা বলিল।

অশোক দেখিল পার্শ্বে ছোট একটি পৃথক শয্যায় অনুপ্রভার ছোট্ট মেয়েটি এতক্ষণ ঘুমাইতেছে। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল।

ক্রন্দনের সুরে চমকিত হইয়া আবার অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীর গলার আওয়াজটা অমন হল কেন ?"

অনুপ্রভা তৎক্ষণাৎ খুকীকে কোলে তুলিয়া বলিল, "কি রকম ঠাণ্ডা লেগেছে। ভিতরে ভিতরে বড্ড সর্দ্দি হয়েছে।" বলিয়া সে অত্যন্ত

উদ্বিগ্ন ভাবে খুকীর পানে চাহিয়া তাহাকে স্তন্য পান করাইতে গেল।

অশোক নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মাটির মেঝে, একটা চৌকিরও ব্যবস্থা করতে পারলাম না, তা আর ঠাণ্ডা লাগবে না!"

খুকী কোলে উঠিয়া, চুপ করিয়াছিল, কিন্তু দুই এক বার দুগ্ধহীন মাতৃস্তন টানিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক মুহূর্ত্তে তাহার বিস্ফারিত চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিল, "কোথেকে মায়ের মাইয়ে দুগ্ধ আসবে! একে অসুখ, তার উপর অনাহারে অচিকিৎসা, দুধের আর অপরাধ কি?

খুকী আর একবার মাতৃস্তন্য টানিবার চেষ্টা করিয়া খুব জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক অনুপ্রভার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "ফিডিং বোতলটা কোথায় গেল? সেইটেই দিয়ে দি।"

অনুপ্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অশোক উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে বোতলটা আনিয়া কহিল, "দুধ কৈ? এতে ত দুধ নেই!"

অনুপ্রভার মুখ শুকাইয়া গেল। কুমুদ পিতাকে দুধের খোঁজ করিতে দেখিয়া কহিল, "দুধ আজ আনেনি ত বাবা। খুকি কি খাবে?"

কথাটা বজ্রের মত অশোকের বুকে গিয়া বাজিল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মোটেই বুঝি দুধ দেয় নি? দাম পায়নি বলে বুঝি সে বন্ধ করেছে? আজ সমস্ত দিন কি খেলে।"

অনুপ্রভা বলিল, "বোস গিন্নি খানিকটা দুধ দিয়েছিলেন। তাতেই চলে গেছে।"

অশোক হতাশ হইয়া শয্যায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "পরের কাছে ভিক্ষে করেও এক সের দুধ সংস্থান করতে পারা গেল না! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল। উঃ!"

অনুপ্রভা ভয়ে ভয়ে কহিল, "তুমি অমন কোরো না; এখনও আধসেরটাক দুধ আছে। ঐ তাকের উপর আছে, পেড়ে দাও না।"

"তা হলে তুমি কি খাবে?"

"আমি ত সাবু খেয়েছি। তাতেই আমার পেট যথেষ্ট ভরে গেছে।"

অশোক আর সহ্য করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আপনার উচ্ছ্বসিত রোদন বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। তবু মুখ দিয়া একটি আর্ত্ত স্বর বাহির হইল।

অনুপ্রভা তাড়াতাড়ি খুকিকে বিছানায় রাখিয়া নিজে মাথাটা স্বামীর পায়ের উপর রাখিয়া মৃদু সিক্ত কণ্ঠে কহিল, "চুপ কর। তুমি অমন করলে আমি কি করব"

খোকা বাপ মায়ের অবস্থা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা দিন বা একটা রাত্রি কিংবা অন্ততঃ খানিকটা সময় এমন ভাবে কাটে যে, সে তাহা চিরজীবনের মধ্যে কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর ক্ষুধাতুর অবস্থা দেখিয়া অশোকের অন্ধকার রাত্রি সেইভাবে কাটিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে অতি অল্পক্ষণের জন্য অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সদানন্দ পুত্রও আজ ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট মেয়েটি সাবুর জল খাইয়া শ্লেষ্মায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে। স্ত্রী শুষ্ক মুখে

ম্লান নেত্রে কোলের মেয়েটীর পানে মাঝে মাঝে চাহিতেছে, আর কুমুদকে বুঝাইতেছে, "চুপ কর। তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে বাবা। এখনি ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অশোক আধ ময়লা চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, জুতা যোড়াটা কোন মতে পায়ে ঢুকাইয়া বাহির হইতে গেল।

অনুপ্রভা ব্যস্ত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাচ্চ ? অন্ততঃ হাত মুখটা ধুয়ে বেরিও।"

অশোক ততক্ষণ দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেখান হইতে কহিল, "আজ একবার শেষ চেষ্টা করব।"

অনুপ্রভা শয্যার উপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কুমুদ, দুয়োরটা বন্ধ করে এস বাবা!"

পিতার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে কুমুদ অতিশয় বিস্মিত হইয়া কান্না বন্ধ করিয়াছিল। মাতার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে দুয়োর বন্ধ করিয়া আসিয়া মায়ের কাছটিতে স্তব্ধ হইয়া বসিল।

অশোক বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, ইহার মধ্যে রীতিমত লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিজের যে একটা নিশ্চিত কায আছে, ইহা সকলেরই মুখভাবে সুস্পষ্ট।

বড় রাস্তায় পড়িয়া অশোক ভাবিল, সে এখন কোথায় যাইবে ? কোথায় গেলে অর্থ আসিবে ? অর্থ এখন তাহার দেবতার মত আরাধ্য। অর্থ আসিলে ঔষধ আসিবে, খাদ্য আসিবে, শিশু পুত্র কন্যা খাইয়া বাঁচিবে।

অশোক পাঠ্যাবস্থায় শুনিয়াছিল যে, বড়বাজারের মাড়োয়ারীরা অনেক সময়ে অনেক টাকা দিয়া প্রাইভেট টিউটার মুনিব্ করে। এ কথার সত্যতা

সম্বন্ধে সে কোন সন্ধানই এযাবৎ কখনও করে নাই। আজ সে স্থির করিল, ঐ মাড়োয়ারি অঞ্চলে ঘুরিয়া দেখিবে, যদি একটা মাষ্টারি যোগাড় করিতে পারে।

কিন্তু এত সকালে কাহার কাছে গিয়া সে বলিবে আমাকে মাষ্টারি দাও। তখন সে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে কলেজ ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে বৌবাজার ষ্ট্রীট্ এই রকম করিয়া ঘণ্টা দুয়েক কাটাইয়া দিল। তার পর আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া হ্যারিসন রোডে পড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিল। কত মাড়োয়ারির বাড়ী সে পার হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে খুকীর গলায় কি রকম একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল এবং দুধ অভাবে গলা ভিজাইবার জন্ম ঈষৎ গরম যেটুকু জলসাবু তাহার মুখে দেওয়া হইতেছিল, তাহা দু'গাল বাহিয়া পড়িয়া গেল।

খুকীর অবস্থা দেখিয়া অনুপ্রভা বড়ই ভীতকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁগা, খুকী এমন কচ্ছে কেন দেখ।" অশোক সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের দাওয়ায় তাহার ময়লা উড়ানি-খানি বিছাইয়া একটু শুইয়া পড়িয়াছিল, একটু ঘুমও বোধ হয় আসিয়াছিল।

স্ত্রীর আর্ত্তস্বরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অশোক এক লাফে ঘরের ভিতরে আসিল।

স্বামীকে দেখিয়াই অনুপ্রভা কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, দেখ, খুকী কি রকম কর্‌ছে। হ্যাঁগা, কি হবে?"

অশোক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, অতটুকু মেয়ের পেট কমিয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। দুধ না পাইয়া যেন অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার মত হইয়াছে। শিশু পুত্র কুমুদ একটা শুষ্ক নারিকেলের মালা করিয়া আধমুঠা ছোলাভাজা লইয়া এক একটি করিয়া খাইতেছিল, কিন্তু মাকে হঠাৎ কাঁদিতে দেখিয়া ঐ মহার্ঘ খাদ্যগুলি হাতে করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক করে বল খুকীকে আজ কতটুকু দুধ খেতে দিয়েছিলে।"

অনুপ্রভা সত্য গোপন করিতে আর সাহস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আজ অন্য দুধ পাইনি। মাইতে যা একটু ছিল তাই খেয়েছে।"

অশোক ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "অ্যাঁ, বল কি! তাহলে এতক্ষণ কি দিয়ে শান্ত করে রেখেছিলে?"

অনুপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সাবুর জলের সঙ্গে ভাতের মাড় মিশিয়ে বারকতক দিয়েছি। মাড়ও যে বেশী ছিল না।"

কথাটি অশোকের কাণে যেন কশাঘাতের মত বাজিল। সে ভয়ে টলিতে টলিতে দাওয়ার কাছ হইতে ময়লা উড়ানি খানা কাঁধে তুলিয়া লইল।

এমন সময় খুকী কি রকম একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া মুখব্যাদান করিল।

"ওগো, তুমি একবার কাউকে ডাক। খুকী বুঝি বাঁচে না।" বলিয়া অনুপ্রভা অত্যন্ত সভয়ে ও কাতর ভাবে স্বামীর পানে চাহিল।

অশোক আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে তখন সঙ্কল্প জাগিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক, এখনই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিতেই হইবে, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ঔষধ পথ্য ডাক্তার সব যোগাড় করিতেই হইবে। ভিক্ষা, চুরী—সব উপায়ের জন্যই সে আজ প্রস্তুত।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর আসিয়া অশোক ভাবিতে লাগিল, কোন পথ সে এখন অবলম্বন করিবে। প্রথমে ভাবিয়াছিল, ভিক্ষা করিবে। কিন্তু তাহার গা ঘেঁসিয়া কত ধনী যুবক চলিয়া গেল, কাহারও কাছে তো হাত পাতিতে পারিল না। অশোক কেমন করিয়া ভুলিবে যে, সে এক দিন এই সব ধনীসন্তানদের মধ্যে কাহারও চেয়ে কম ছিল না। এত অভাবের মধ্যে

পড়িয়াও আজও যে সে কথা অশোক ভুলিতে পারিল না। সম্মুখ দিয়া লোকের পর লোক চলিয়া যাইতেছে, কত বার অশোকের মনে হইল যে একবার কাহাকেও বলে——আমি আজ বড় বিপন্ন, দয়া করিয়া কিছু ভিক্ষা দিন্। কিন্তু কথাটা মন হইতে কণ্ঠের কাছে আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল।

আর একটু অগ্রসর হইতে অশোক দেখিল, এক বাবুর সঙ্গে এক মুটে একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দ্রব্যাদি নামাইল। বাবুটি তাহার হাতে একটি দুয়ানি দিতে গেলে সে বলিল, "বাবু সেই ইষ্টিশন থেকে আস্‌ছি—মোটে আট পয়সা ?"

এই কথাটি শুনিয়া অশোকের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইল। সে তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে শেয়ালদহ ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিল। সে মুটে মোট বহিয়াই পুত্র কন্যাকে বাঁচাইবে। অন্য কোনও পথ যখন সে পাইল না, তখন এই করিয়াই সে দেখিবে।

ষ্টেশনে যখন অশোক পৌঁছিল, তখন ঠিক সন্ধ্যা। একখানা গাড়ী সবে মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দলে দলে লোক বাহির হইতেছে। অনেকের সঙ্গে ষ্টেশনের কুলি।

বাহিরেরএকটি যায়গায় ঝাঁকা লইয়া ও শুধু হাতে অনেক কুলি দাঁড়াইয়া। তাহারা বাহিরের।

অশোক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া অধিকাংশ কুলি মাল লইয়া দর ঠিক করিয়া চলিয়া গেল। সে শুষ্ক কণ্ঠে দুর্ভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া একটা ক্যাম্বিসের বড় ব্যাগ প্রায় অশোকের দেহের উপর ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "চল্ তো রে, ঐ ট্রাম পর্য্যন্ত—দু'পয়সা পাবি, বেশী নয়। শীঘ্র চল্—ট্রাম এখনই ছেড়ে দেবে।"

বলিয়া, বৃদ্ধ হাঁপাইতে হাঁপাইতে অগ্রগামী হইল। অগত্যা অশোক ব্যাগ দুই হাতে বুকের কাছটি পর্য্যন্ত উঠাইয়া পিছে পিছে চলিল। কাঁধে তুলিতে তাহার কি রকম একটা লজ্জা করিতে লাগিল।

ট্রামে উঠিয়া বৃদ্ধ কোমরে বাঁধা একটা গেঁজে খুলিয়া দুটি পয়সা বাহির করিল ও একবার পয়সা দুটি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই নে রে!"

অশোকের মাথা যেন কিসের ভারে নত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল, সকলেই যেন তাহার পানে তাকাইয়া আছে, দেখিবে, কেমন করিয়া জমিদার অতুলকৃষ্ণ রায়ের একমাত্র পুত্র অশোক মোট বহিয়া দুটি পয়সা হাতে করিয়া লয়।

অশোক আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। পয়সা না লইয়াই, সে একটু হাসিয়া এক দৌড়ে ট্রাম হইতে দূরে একটা আলোক স্তম্ভের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রামের কয়েকজন লোক বলিল, "লোকটা পাগল।"

সে ট্রামখানা ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর মিনিট কয়েক অশোক আলোক-স্তম্ভের নীচে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় আর একটা গাড়ীর আরোহী দল নিকটে পৌঁছিল।

একজন অশোকের মুখের পানে তীক্ষ্ণভাবে কয়েকবার চাহিয়া কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

অশোকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এ ব্যক্তিকে বুঝি সে কোথাও দেখিয়াছে। তাহার গ্রামেই না? অশোক আর প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে চাহিতে সাহস করিল না। একটু সরিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যে মিশিয়া পড়িল। তার পর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে হেরিসন রোড়ের সহিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যেখানে মিশিয়াছে সেইখানটায়

আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর কি ভাবিয়া, উত্তর দিকে 'আমহার্ষ্ট' ষ্ট্রীটে মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মিনিট পাঁচেক ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর সম্মুখে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন মনে পড়িল, তাহার বাসা মরণাপন্ন একটি শিশুকন্যা ও ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের ভার এক অসহায়া রুগ্না নারী উপর দিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকাইবার অর্থ তো দূরের কথা এক পোয়া দুধের দামও সে যোগাড় করিতে পারে নাই।

যাহা করিতে হয় এখনি করিতে হইবে। সম্মুখের ত্রিতল অট্টালিক যেন কোনও ধনীর বলিয়াই মনে হইতেছিল। দ্বারে কোনও দ্বারবান বসিয়া ছিল না। মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

উপরে পায়ের শব্দ হইতেছিল। পার্শ্বে একটু দূরে লোকজনের কথাবার্ত্তাও শুনা যাইতেছিল। কিন্তু সে সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, যাহার নিকট নিজের অভাব বা মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা চাহে।

আর একটু অগ্রসর হইলে কাহাকেও না কাহাকেও নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, এবং এখন সে মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা করিবেই করিবে—এই ভাবিয়া অশোক বারান্দার উপর উঠিয়া আসিল।

বারান্দায় উঠিয়া অশোক দেখিল, সেখানেও কেহ নাই। শুধু সম্মুখে চেয়ার টেবিল দিয়া সজ্জিত একটা ঘরে সুদৃশ্য আলো জ্বলিতেছিল। হয় ত এই ঘরে কেহ আছে, এই ভাবিয়া অশোক ধীরে ধীরে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, ইহা ভাবিতেই অশোকের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু ঘরের ভিতর ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে তখনও কেহ আসে নাই।

কেহ না কেহ এখনি আসিবে, এই মনে করিয়া অশোক সেখানে অপেক্ষা করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার লক্ষ্য পড়িল টেবিলের উপরকার একটা রিষ্টওয়াচের উপর। আর মনে পড়িল বাড়ীর সেই সাঙ্ঘাতিক অবস্থা—সেখানে হয়ত এতক্ষণ মৃত্যুর হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

সামান্য অশুচিতার ভিতর দিয়া যেমন নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ এই দারুণ অভাবের মধ্য দিয়া লোভ ও মোহ আসিয়া অশোকের চিত্ত বিদ্যুদ্‌বেগে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, কখন কে আসিবে, আসিয়া কিছু সাহায্য করিবে কি তাড়াইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। তাহার চেয়ে ঐ ঘড়িটা লইলে তো এখন বাঁচিয়া যায়। ঘড়িটা বেচিলে অন্ততঃ ১০ টাকাও তো পাওয়া যাইবে।

তখনি আবার মনে হইল, এ যে চুরী—নিতান্তই হীন কায! শেষটা বংশ, জীবন সব কি এক মুহূর্ত্তে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে?

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল মরণাপন্ন শিশু কন্যার ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, ক্ষুধাতুর পুত্রের ক্রন্দন, রুগ্না পত্নীর ম্লান বেদনাতুর দৃষ্টি!

বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। শেষে প্রলোভনেরই জয় হইল। অশোক ঘরের মধ্যে একটু অগ্রসর হইয়া, কম্পিতপদে স্পন্দিতবক্ষে রক্তহীন হস্ত দিয়া টেবিলের উপর হইতে ঘড়িটা তুলিয়া, চারিদিকে একবার চাহিয়া, একটু দ্রুতপদে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

গেটের কাছে পৌছিতেই কে যেন অন্তরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—চোর!

হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অশোক ভাবিল, তাই তো, শেষটা চুরী করিতে হইল? সমস্ত জীবনটা কি একটা দিনের এক মুহূর্ত্তের ঘটনায় এমনি

করিয়া কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে? পিতামাতা তো তাহাকে ত্যা করিয়াছেন; শেষটা ভগবানের দ্বারাও কি সে পরিত্যক্ত হইবে?

আবার মনে পড়িল সেই কাতর-ক্লিষ্ট পুত্র কন্যার মুখ।

হউক্, যা হইবার তাহাই হউক্, সে এমন করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিবে না। আর এই কলঙ্কের পসরা পুত্র কন্যার শিরে চাপাইয়া যাইবে না।

অশোক স্থির করিল যে ঘড়ি ফিরাইয়া রাখিবে; তার পর ভিক্ষা চাহিবে। মিলে ভাল। না মিলে অন্যত্র চেষ্টা করিবে। আর এই যে বিলম্ব—এই সময়, তুমি তাদের দেখিও ভগবান্।

সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে মনে বল আসিল। অশোক দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল এবং তার পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর ঘড়িটী রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটিয়া আসিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"ভবে রে শালা! আর চুরির যায়গা পাওনি?"

থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অশোক ঘরের সেইখানে বসিয়া পড়িল। যে লোকটি ধরিয়াছিল, সে 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উপবিষ্ট অশোককে টানিয়া হিঁচড়াইয়া বারান্দায় আনিয়া ফেলিল।

একটু পূর্ব্বে একটাও লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখন সে বাড়ীর বাবু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল এবং সকলে মিলিয়া, ভয়ে কম্পমান ও লজ্জায় ম্রিয়মান অশোককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অশোক আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া সমস্ত প্রহার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

যে যুবকটি প্রথমেই অশোককে ধরিয়াছিল, সে তখন বলিল, "এই

শুয়া, যাতো, শালাকে এখনি থানায় নিয়ে যা। যা, এখনি যা।' এতক্ষণ এত নির্ম্মম প্রহার যে নিস্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিল, থানায় যাইবার কথা শুনিবামাত্র সে করযোড়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই আপনাদের বাবু, আমায় আরও মারুন, মেরে ফেলে দিন। আমায় থানায় দেবেন না।"

"থানায় দেব না তোমায়? গোপাল আমার! হয়েছে কি তোমার এখন, ঘানি টানবে যখন তখন এর মর্ম্ম বুঝবে।" বলিয়া সে লোকটি এক বলিষ্ঠ উড়িয়া ভৃত্যের হাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

"আপনাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। আমার বাসায় আমার স্ত্রী মেয়ে মরমর, ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করছে, আমার স্ত্রী মরণাপন্ন, তারা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সত্যি বল্‌ছি, আমি ভদ্র লোকের ছেলে, ভিক্ষা করতে এসেছিলাম। চোর নই।"

উপরের কোণের একটি সুসজ্জিত ঘরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া পাইচারী করিতেছিলেন, এমন সময় নীচেকার কোলাহল ও অশোকের সেই আর্ত্তস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। এত দিন পরে—এ তাহারই কণ্ঠস্বরের মত নয়?

মন তাঁহার এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল যে, সেখানে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "আহা, কে কাকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছে রে! এস তো সনাতন আমার সঙ্গে।"

বলিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তিনি বরাবর নীচে নামিয়া আসিলেন। ভৃত্য নীরবে প্রভুর অনুসরণ করিল।

ইনিই অতুলকৃষ্ণ। তীর্থাদি শেষ করিয়া দুই মাস হইতে পুত্রের আগমন আশায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

ঘরের ভিতরকার আলোতে, চৌর্য্যাপরাধে ধৃত যুবকটিকে দেখিবামাত্র অতুলকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিলেন। আশা ও আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"সনাতন, একটা আলো আন ত, কে দেখি।"

সনাতনেরও সন্দেহ হইয়াছিল। সে ছুটিয়া পাশের ঘর হইতে একটা লণ্ঠন আনিয়া সম্মুখে ধরিল।

বিস্মিত, স্তম্ভিত ও রক্তাক্ত হৃদয়ে অতুলকৃষ্ণ দেখিলেন, যাহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চক্ষু আজ অন্ধ হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহিণী লোকান্তরে চলিয়া গেলেন, যাহার সন্ধানে জলের মত দুই হাতে অর্থব্যয় করিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই তাঁহার একমাত্র বংশধর, তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী অশোক তাঁহারই বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে,—আর তাঁহার নামমাত্র আত্মীয় অপদার্থ গলগ্রহ লোকগুলা, তাঁহারই বাড়ীতে তাহাকে ধরিয়া এমন নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতেছে—আর সে কাঁদিয়া বলিতেছে—"আমার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী মরমর, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি চোর নই।"

উঃ, অদৃষ্টের এ কি ভয়ঙ্কর পরিহাস! খানিকক্ষণ অতুলকৃষ্ণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তার পরই যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অশোককে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। অশোক ধীরে ধীরে পিতার বক্ষ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, পিতার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অতুলকৃষ্ণ তখন পাগলের মত সেই বারান্দায় ছুটাছুটী করিতে করিতে ও এক একবার অশোকের গায়ে হাত বুলাইয়া যেন তাহার প্রহারের বেদনা উপশম করিয়া দিতে দিতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"সনাতন, ও সনাতন, বাড়ীর ভিতর থেকে কাউকে সঙ্গে করে, শীগ্‌গির বৌমাদের নিয়ে

এস !—ও অশোক, বাবা, কোন্ ঠিকানায় যাবে শীগ্‌গির বলে দে।—হ্যাঁ সনাতন, শুন্‌লে তো? যাও শীগ্‌গির ঐ ঠিকানায় গিয়ে, তারা যে অবস্থায় আছে তাদের নিয়ে এস। উপেন শীগ্‌গির যাও, ডাক্তার বাবুকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস। কি জানি যদি দরকার হয়।”

উঃ! তাঁহার দেবচরিত্র পুত্র তাঁহারই বাড়ীতে তাঁহারই চোখের সম্মুখে চোরের মত মার খাইল! আর মারিল কে? না, যারা অন্যায়ভাবে তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের মত আসন পাতিয়াছে। আর তাঁহার কত সাধের পুত্রবধূ ও পৌত্র পৌত্রী আজ অনশনে বিনা চিকিৎসায় তাঁহার দুয়ারের গোড়ায় মরিতে বসিয়াছে! আর তিনি তাহাদেরই সন্ধানের জন্য সর্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়া, এত কাছে থাকিয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই।

তখনি মনে পড়িল সরস্বতীর কথা। সে যে অশোক অশোক করিয়া অশোকের সন্ধানে নিরাশ হইয়া অকালে প্রাণ বাহির করিয়াছে, তাহাকে এখন কোথায় ফিরিয়া পাওয়া যাইবে?

অতুলকৃষ্ণ পুত্রের হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—"অশোক, তোকে তো শুধু আমি পথের ভিখারী করিনি, তোকে যে মাতৃহীনও করেছি। তোর সব চেয়ে বড় জিনিস যে কেড়ে নিয়েছি। তিনি যে তোর নাম করতে করতে তোকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে গেলেন। ওরে, দুটো মাস আগেও যদি আস্‌তিস্, তাহলেও তিনি তোকে দেখে যেতে পারতেন।"

“মা নাই” শুনিয়া অশোক ছিন্ন তরুর মত পিতার পদতলে লুটাইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত কষ্ট, এত দুঃখ পাইয়াও শেষে বাড়ী ফিরিয়া মাকে দেখিতে পাইল না; আর কখনও দেখিতেও পাইবে না।

অশোক শুধু 'মা, ও মা, মাগো!' বলিয়া সেই ভূমিতলে লুটাইয়া

লুটাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল, আর অতুলকৃষ্ণ সজল নেত্রে বসিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তার পর খানিক ক্ষণের জন্য পিতাপুত্রের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। কোথা দিয়া যে কতখানি সময় কাটিয়া গেল, তাহার কোন হিসাব রহিল না।

এমন সময় অনুপ্রভা ও ছেলে মেয়েকে লইয়া একখানি গাড়ী, এবং ডাক্তারকে লইয়া আর একখানি গাড়ী গেট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

অতুলকৃষ্ণ পুত্রের হস্ত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সরস্বতীকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সবই হল, সবই ফিরে পেলুম, কিন্তু তোমার অভাবে, এত আনন্দ যে আমার অপূর্ণ রয়ে গেল। এ দুঃখ যে আমার কিছুতে যাবে না। ওগো, একটী বারের জন্যেও কি আজ ফিরে আস্‌তে পার না?